এখন ডুয়ার্স

ডিসেম্বর ২০১৫। ১২ টাকা

কোচবিহার রাসমেলা

আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স উৎসব

পর্যটন শিল্পে অনাদৃত কেন?

গৌতমের মনসবদারিতে এবার ডুয়ার্সের হাতি হানা?

পার্পল টি ডুয়ার্সের চা শিল্পে বিপ্লব এনে দিতে পারে

নতুন পিকনিক স্পট লালিগুরাস

হারিয়ে যাওয়া রাজবংশী ডিশ

ডুয়ার্স জুড়ে নাট্য উৎসব

টম্ টম্ টম্ গাড়ি
সাগরদীঘির স্বচ্ছ জলে রোদের বাড়াবাড়ি
মদনমোহন মূর্তি উধাও—খোঁজায় পড়ে দাঁড়ি?

টম্ টমাটম্ গাড়ি
রাস্তা জুড়ে হাজার দোকান শাল সোয়েটার শাড়ি
গলিয়ে সোনা কোথায় গেছে বলতে কি কেউ পারি!

টম্ টম্ টম্ গাড়ি
পদ্মা থেকে নধর ইলিশ মেলায় দিল পাড়ি
গুড় বেচে যে হাস্যমুখে বাংলাদেশে বাড়ি!

টম্ টমাটম্ গাড়ি
সার্কাসের ওই লাইটগুলো চোখ ধাঁধাল ভারি
ভেটাগুড়ির রসের প্যাঁচে এবার কাড়াকাড়ি!

টম্ টম্ টম্ গাড়ি
দুই কাঠিতে বলছে বোধহয়— একটু তাড়াতাড়ি
দাও ফিরিয়ে মদনমোহন— নইলে কিন্তু আড়ি!

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে সাত্যকি বিশ্বাস

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫

এই সংখ্যায়

এখন ডুয়ার্স

চাঁদের আলোয় রাসচক্র আজও ঘুরছে ৮
সর্না ১১
রাধিকাবিহীন রাসলীলায় বেশি গুরুত্ব পায় মানুষের মিলন উৎসব ১২
গৌতমের মনসবদারিতে এবার ডুয়ার্সের হাতি হানা? ১৪
ডুয়ার্স উৎসব? নাকি আলিপুরদুয়ার উৎসব? ১৬

জনজাতির ডুয়ার্স

নাগেশিয়াদের কথা ১৮

ধারাবাহিক

পার্পল টি ডুয়ার্সের চা-শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে ১৯
ছিটমহলঃ ওপারের দস্যুদের মতোই এপারের 'অন্ধা কানুন'ও কখনও রেয়াত করেনি ওদের ৩০
তরাই উৎরাই ৩৪
বসন্তপথ ৩৮

পর্যটনের ডুয়ার্স

পর্যটনে সম্ভাবনাময় মাথাভাঙা মহকুমা ২৫
অবহেলায় ডুয়ার্সের সবেধন টেরাকোটা মন্দির ২৭
লালিগুরাস ডুয়ার্সের নতুন পিকনিক স্পট ৩২
সাতখাইয়া পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র ও বিশ্রামাগার ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

ডাকে ডুয়ার্স ৬
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ৩১
ডুয়ার্সের মুখ ৫০
ডুয়ার্সের ডিশ ৫৩

সংস্কৃতির ডুয়ার্স

জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্স নিয়ে নাট্যপ্রেমীদের আশাভঙ্গ ৪৭

রাসমেলা স্পেশাল

কোচবিহারের লোকায়ত জলছবি ৫৫

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের নতুন অফিস খুলল
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি পৌরসভার পুরবাসীর প্রতি খোলা চিঠি

হে পুরবাসী

দীপাবলী ফুরলো, ছট পুজোও শেষ। উৎসবের পালা ফুরিয়ে এখন শীত আসার পালা। শহরের পথে প্রাতঃভ্রমণকারীরা বের হবেন শীতের পোশাক পরে। সূর্যের প্রথম আলো তিস্তার বুকে পড়ার আগেই ইতিউতি চায়ের দোকান খুলতে শুরু করবে। আর, এসবের আগে থেকেই কিন্তু পুরসভার সাফাই কর্মীরা নেমে পড়েছেন রাস্তায়। পানীয় জলের যোগান চালু করার জন্য লেগে পড়েছেন আরও কর্মী। জঞ্জাল তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য চালু হয়ে গিয়েছে গাড়িগুলির ইঞ্জিন।

মা-মাটি-মানুষের পুরসভা সব সময় খেয়াল রাখে পরিষেবা বিষয়ে। পুরবাসী দেখছেন তাঁর পথ-ঘাট-আলো-জল-সাফাই। দেখছেন উপযুক্ত হাতে নির্দিষ্ট ভাতা পৌঁছে যাওয়া। পুরনাগরিকদের প্রাথমিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও আপোষে রাজি নই আমরা। আরও পানীয় জল, আরও আলো, আরও পরিচ্ছন্নতা, শংসাপত্র দিতে আরও তৎপরতার দিকে যেতে চাইছি। আত্মতৃপ্তির কোনও অবকাশ নেই।

আমরা জানি, পুরবাসীর উপলব্ধিতে তা ধরা পড়েছে। পুরসভার কাছে পুরবাসীর মনের চাহিদার ভাষা আমরা পড়তে পেরেছি। মানুষের মনের ভাষা পড়তে পারাটা মা-মাটি-মানুষের দলের ধর্ম। তাই আমরা উন্নয়ন শব্দের অর্থ জানি। আমাদের হাতে ১৩০ বছরের পুরনো পুরসভার দায়িত্ব তুলে দিয়ে পুরবাসী যে ভুল করেননি, তা খোলা মনে শহরের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

আমরা স্বপ্ন দেখছি উন্নততর জলপাইগুড়ি শহরের। পুর পরিষেবার পাশাপাশি শহরের উন্নত চেহারাটাও আমাদের স্বপ্নের কেন্দ্রে বর্তমান। এর পেছনে রয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা।

তাই আমরা পুরবাসীরা স্বপ্ন অনুভব করতে পেরেছি। তাঁদের সমর্থন পেয়েছি। মা-মাটি-মানুষের উন্নয়নের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি আমাদের নৌকো।

শীতে মেতে উঠুন আনন্দে। নরম রোদ্দুরে আমাদের জলপাইগুড়ি শহর ঝলমল করে উঠুক। আমরা আছি সেই আনন্দের পেছনে। কাকভোর থেকে প্রয়োজনে গভীর রাত অবধি।

শুভেচ্ছা সহ।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

ভগবতী জুয়েলারী
হলমার্ক যুক্ত গহনা পাওয়া যায়
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
সুনীতি রোড, হরিশপাল চৌপথী,
কোচবিহার, ফোন ০৩৫৮২-২২৪৪৯৮

Hotel
Yubraj
&
Restaurant
Monarch
(Air Conditioned)
GARMENTS
Room | Single | Double
Super deluxe (non AC) | Rs 600 | 800
Deluxe AC | Rs 900 | 1100
Super Deluxe AC | Rs 990 | 1200
VIP Deluxe AC | Rs1600 | 1600
Suite | Rs 3000 | 3000
Extra PAX (Non AC) | Rs 100 | -
Extra PAX (AC) | Rs 200 | -
NB tax As per Applicable
Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

WELCOME TO HERITAGE CITY COOCHBEHAR
HOTEL GREEN VIEW
Suit AC, Super Delux, AC,
Non AC , Conference Hall
HOTEL
Green View
Food & Lodging
Badurbagan Chowpathi, Coochbehar, Contact (03582) 224815/ 229081 (0), 9434756733 (M)

ঐতিহ্য আর পরম্পরার কোচবিহার রাসমেলায় সমস্ত মানুষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

জনমুখী কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছে কোচবিহার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার উন্নয়নের পথে যে গতি এনেছে, সেই গতির ধারায় কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকেও চলছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। নিকাশী নালা, পানীয় জল, পথ-ঘাট নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এক নতুন দিশায় পৌঁছতে চাই আমরা। জেলায় এখনও পর্যন্ত ঘোষিত নির্মল গ্রাম ঘুঘুমারীর বারুইপাড়া এই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। নির্মল বাংলা গড়ার অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ আমরাও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত-পরিবহণ কার্য বিভাগ বহুমুখী কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছে। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। ধন্যবাদ সহ

স্বপন কুমার পাত্র
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১নং ব্লক

খোকন মিঞা
কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত ও পরিবহণ কার্য বিভাগ
কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি।

কোচবিহার ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি

ধলুয়াবাড়ি, কোচবিহার

রাসমেলায় পর্যটনের বরাদ্দ বাড়ুক!

বছর তিনেক হল কোচবিহার রাসমেলায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তিনশো স্কোয়্যার ফুটের স্টল হয়। যেখানে ছবিতে-ভাষায় তুলে ধরা হয় পশ্চিমবঙ্গের নিসর্গ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। নিজের রাজ্যকেই ঠিকঠাক জানার সুযোগ পায় না ডুয়ার্সের মানুষ— তাই এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। জানা

> পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর মেলা গত কয়েক বছর ধরে যখন এত আড়ম্বরে করা সম্ভব হচ্ছে তখন কোচবিহার রাসমেলা নয় কেন?

গেল, এবারের সাংস্কৃতিক মঞ্চে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে নাটকও নামানো হচ্ছে কৃষ্ণ ও রাসলীলা নিয়ে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন দুশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটি ঘিরে পর্যটন দপ্তরের বাজেট এবং কর্মসূচি এর চেয়ে বাড়ানো হচ্ছে না কেন? বিষ্ণুপুর মেলা যখন এত আড়ম্বরে করা সম্ভব হচ্ছে তখন কোচবিহার রাসমেলা নয় কেন? নিদেনপক্ষে খবরের কাগজে বা হোর্ডিং-এ কয়েকটি বিজ্ঞাপন তো প্রকাশ করে গোটা বাংলার মানুষকে জানানোর শুভ দায়িত্বটুকু পালন করতে পারতেন আমাদের রাজ্যের পর্যটন দপ্তর!

দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছু নতুন মেলা বা উৎসব যদি সরকারি উদ্যোগে শুরু হতে পারে, তবে উত্তরবঙ্গ উৎসব তো রাসমেলাকে ঘিরেই হতে পারত? পর্যটনপ্রেমী দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যদি এসময় উত্তরবঙ্গে ভিড় জমাত তবে একই বাংলার দুই প্রান্তের মানুষের ভাবনা-সংস্কৃতির আদানপ্রদান সম্ভব হত। ভাওয়াইয়ার সঙ্গে মিশে যেত বাউলের সুর। বঞ্চনা ও অবহেলার মানসিক যন্ত্রণা থেকে খানিক হলেও মুক্তি পেত ডুয়ার্সের মানুষ। এটা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

সব পুজো তো গেল... এবার ভোটপুজো না এলে খাবো কী?

দিন ফুরোলে রোজ বারো-চোদ্দো পাতা ভরাট করা কি মুখের কথা? চব্বিশ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেলে অবশ্য কিছুটা রক্ষা, ঘণ্টা তিন-চারের পিন্ডি বানিয়ে ফেলতে পারলেই হল, সেটাকেই লুপে ফেলে দাও। পুজোর মরশুমে বিজ্ঞাপনের ভিড়ে সেই চাপ অনেকটাই কম থাকে। আর পুজোর ক'টা দিন তো মণ্ডপ থেকেই বকবক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পুজোর পর্ব এবার শেষ। অতএব আবার সেই হাঁড়ি ঠ্যালো। কবে কোন দাদা একটু বেসামাল বলে ফেলবে, কবে কোথায় মানুষ খুন হবে, কবে কোথায় নারী লাঞ্ছনা ঘটবে তার অপেক্ষায় কি আর দিন চলে? তবুও শুনছি নতুন বছর পড়লে নাকি ভোটের বাদ্যি বাজবে। বাজলেই বাঁচি বাবা! মিডিয়ার জ্বালা আর কে বোঝে বলুন!

কালীর কাঁটা

ডুয়ার্সের কালী প্রতিমা ভাইফোঁটার পরেও অনেক জায়গায় বহাল তবিয়তে মণ্ডপস্থ হয়েছিল। এখন বিসর্জনের পালা শেষ। বিভিন্ন জায়গায় মণ্ডপ খোলার কাজ চলছে জোর কদমে। ফি বছর এই মণ্ডপ খোলার সময়ে ডুয়ার্সের হেথা হোথা সাইকেল, রিকশা, টোটো এমন কী চার চাকাদেরও টায়ার পাংচার হওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। মণ্ডপ থেকে উৎপাটিত তারকাঁটা, ছোট পেরেক ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। সেসব আর পরিষ্কার করার ঝক্কি সামলাতে চায় না পুজো কমিটিগুলি। প্রায় সাত দিন উৎসবের পর এই সব ঝামেলা কি পোষায়। ফলে চলমান টায়ার পেলেই ফটাস!! তাই ডুয়ার্সের বিভিন্ন জনপদে ফট, ফটাস, দুম— এসব শব্দ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে ব্যস্ত রাস্তায়। একটা করে শব্দ হচ্ছে আর হাসি ফুটছে টায়ারের লিক সারাইয়ের দোকান মালিকদের। রসিক পথচারী চটির তলা থেকে পেরেক বের করতে করতে বলছেন, 'হোদ্দ্যাখো মোর জুতাখান পামচার হইচে!'

এই সব ক্ষুদ্র কন্টকের নাম হল 'কালীর কাঁটা'।

মুকুল রহস্য

মুকুল তো এখন ভ্যানিশ নন, বরং কিছুদিন আগেই ডুয়ার্সে হানা দিয়েছিলেন। যেদিন এলেন সেদিন ডুয়ার্সের তাবড় তাবড় তৃণমূল নেতারা বরং কোথায় জানি ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন। মেজো নেতারা মুকুলের দশ কিলোমিটারের মধ্যেই যাননি, পাছে দল থেকে ভ্যানিশ হয়ে যান। তা সত্ত্বেও চালসার বাংলোতে মুকুলের সঙ্গে রাশি রাশি নেতারা যারা দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁরা কারা? জোর গুজব, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত বাম বা কং থেকে এসেছিলেন, কিন্তু বাকিদের মধ্যে হাতে গোনা গুটিকয় বিজেপি বাদ দিলে বাকিরা তো...। ওই এ দল সে দল থেকে যারা

ঘাসফুলে আস্তানা গেড়েছিলেন, তাঁদের বেশ কয়েকজনকে তো মুকুলের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসতে দেখলেম দাদা! তবে আদি তৃণমূলের কোণঠাসা বিস্তর পাবলিক সে দিন চালসায় কী করছিলেন? হুঁ হুঁ বাবা! ডুয়ার্সে মুকুল ভালই প্রস্ফুটিত হচ্ছে সে খবর কী আমরা রাখি নে?

আবার অনেককেই বলতে শুনলাম—পুরোটাই গটআপ গেম বাবা! আসলে মুকুল নাকি দেখতে চাইছিলেন যেগুলিকে বস্তাভরা মালের বিনিময়ে দলে ভিড়িয়ে ছিলেন সেগুলি এখন তাকে দেখে চমকায় কি না! এখনও কারা জেনুইন আর কারা নয় তা জানতেই নাকি এই সফর। শুনে তো সবার চোখ ছানাবড়া।
রহস্য। বেজায় রহস্য!

ছটের ফাঁকে

ডুয়ার্সের নানা স্থানে বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাই ছট পুজো এলে ডুয়ার্সের নানা নদীর ঘাট সুন্দরভাবে সেজে ওঠে। পূণ্যার্থীরা পুজোয় মাতেন। প্রসাদ হিসেবে ঠেকুয়াও বেশ জনপ্রিয় অবিহারী সমাজে। বাঙালি সমাজেরও কেউ কেউ মানত রাখেন ছট দেবতার উদ্দেশে। কাক ভোরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন সূর্যোদয়ের জন্য। এই রকমই ঘটে প্রতিবছর। কিন্তু এবছর চোরেরা ফন্দি এঁটেছিল বোধহয়। কারণ বিহারী পরিবারগুলি থেকে প্রায় সকলেই পুজোর কারণে আগের দিন বিকেল থেকেই ঘাটে ভিড় জমান। ভোর রাতে পুজোর কারণে খালি পড়ে থাকে বাড়িঘর। আর সেই সুযোগে এবার ছটপুজোর রাতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় চোরেরা হানা দিয়েছে ফাঁকা বাড়িতে। শিলিগুড়িতে সব চাইতে বেশি চুরির ঘটনা ঘটেছে এবার। ঘাট ফেরত মানুষেরা অনেকেই আবিষ্কার করেছেন ঘরের তালা ভাঙা। হাওয়া হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু জিনিস, টাকাপয়সা। যথারীতি চোর পালানোর পর পুলিশ বলছে, 'ভাবতে হবে'।

সেই সব বোয়ালেরা

পর পর দু-বার কারা জানি বিষ ঢেলেছিল করলা নদীতে। শহর লাগোয়া নদীর এলাকায় ভেসে উঠেছিল রাশি রাশি পরলোকগত মৎস্য। এর পর নদী ভুগতে শুরু করল মৎস্যহীনতায়। জলপাইগুড়ির করলা বাঁচাও কমিটির সদস্যদের দাবী মেনে তিস্তা খালের

জল করলা দিয়ে পাঠিয়ে শুদ্ধিকরণের পর ছাড়তে শুরু করা হয়েছিল মাছের ছানা। এর পরেও কয়েক বছর ধরে উধাও ছিল করলার বিখ্যাত ফোলুই, বোয়ালেরা। এতদিনে আবার তাদের দেখা যাচ্ছে। করলায় মৎস্য শিকারীদের ফাঁদে ধরা পড়েছে সেই সব বোয়ালেরা যাদের গ্রেপ্তার করার জন্য একসময় দূর দূরান্ত থেকে শিকারীরা এসে করলায় ছিপ ফেলতেন। শুধু তাই নয়, ফিরে এসেছে কচ্ছপও। এই সংবাদে খুশি শহরবাসী। অপরাধ জগতের রাঘব বোয়ালদের টিকি না পেলেও করলার বোয়ালদের পাওয়া যাচ্ছে এখন। সঙ্গে তেমনই এক বোয়াল গ্রেপ্তারের ছবি। মৃদুল দেব-এর সৌজন্যে।

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

গত অর্ধ শতাব্দী ধরে ডুয়ার্স ভূমিতে রাজনৈতিক লীলাখেলা, উত্থান-পতন কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে, কতটা বিবর্তন ঘটেছে এই দীর্ঘ সময়ে?

সত্যি কথা বলতে এখনও পর্যন্ত তার কোনও ধারাবাহিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

রাজনীতির মানুষ হলেও দেবপ্রসাদ রায় ওরফে মিঠুদার গ্রহণযোগ্যতা রাজনীতি নিরপেক্ষ। ডুয়ার্স ভূমি থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছবার ইতিহাস বিরল। আকৈশোর রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে এবং কর্মক্ষেত্র প্রায় গোটা দেশ ছড়িয়ে থাকার দরুন তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা বিচিত্র।

এই বিচিত্র জীবনের ধারাবাহিক কাহিনি প্রকাশিত হচ্ছে ১ জানুয়ারি সংখ্যা থেকে। সুখপাঠ্য এই ধারাবাহিকে উঠে আসবে ডুয়ার্সেরও নানা অনুষঙ্গ, ঘটনাবলী, স্মৃতি। শুরু থেকেই শুরু করে দিন।

জানুয়ারি ২০১৬ থেকে 'এখন ডুয়ার্স' পাক্ষিক প্রকাশিত হবে মাসের ১ ও ১৫ তারিখ।

চাঁদের আলোয়

রাসচক্র আজও ঘুরছে

রাসমঞ্চ, কয়েক হাত মাটি ছেড়ে সেই রাসচক্র। মদনমোহন বাড়ির সেই ঘাসজমিতে রাসচক্র সেদিনও দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও দাঁড়িয়ে থাকে। রাসচক্রের গায়ে রকমারি ছবি। কাগজ কেটে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত। সেসব ছবি বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের ছবি। রাসচক্রটিও তৈরি করেন বংশপরম্পরায় এক মুসলিম পরিবার। সেই কতদিন আগের কথা। তখনও করতেন, আজও করেন। এখনও সেই বাঁশের তৈরি পোক্ত রাসচক্র, যাকে অপূর্ব সজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়, রঙিন করে তোলা হয়, তার বাঁশের খুঁট ধরে চক্রের মতো ঘুরিয়েই রাসমেলার শুভসূচনা হয় পূর্ণিমা রাতে। গুরু নানকের উজ্জ্বল মুখ, আকাশের পূর্ণ চাঁদ আর গৌরাঙ্গের গৌর স্বর্ণকান্তি একাকার হয়ে যায় সে মুহূর্তে— শুরু হয় উৎসব কোচবিহার জুড়ে। এ উৎসব যে কোনও নামকরা, যে কোনও জায়গার, যে কোনও উৎসবকে হার মানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এ যে আমাদের মহারাজার ছুঁয়ে থাকা এক স্বপ্নকথা। স্বপ্ন-সার্থকতার গল্প। অসাম্প্রদায়িক, অবিচ্ছিন্ন, স্বচ্ছ মানসিকতায় সব মানুষকে কাছে টেনে পথ চলার গল্প। সেই কোন আমল থেকে (মহারাজার আমল), তারপর দেবোত্তর বিভাগ পরিচালনা করছেন কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির যাবতীয় কাজ। রথের মেলা দু'-দুটো। জগন্নাথের মাসিবাড়ি যাওয়া আর উলটো রথে ফিরে আসা। আর এই রাসমেলা ঘিরে এক নস্টালজিয়া, কোচবিহার ছেড়ে আসা মানুষের মনের মধ্যে যেমন, তেমনই প্রাচীন হয়ে যাওয়া মানুষরা ভোলেন না সেই উৎসব আর রাজ আমলের কথা। এ দিঘির শহর। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির সামনে বৈরাগী দিঘি, যার স্বচ্ছ জল বারবার টেনেছে, স্বপ্ন দেখিয়েছে, কল্পনায় কতবার সে দিঘির জলে এপার-ওপার করছে এক মেয়ে। কল্পনা— কারণ, জলে নামা নিষেধ ছিল যে ওই মেয়ের। অথচ সেই স্বচ্ছ জলের কত গল্প শুনেছে সে, তাকিয়ে দেখেছে, দাঁড়িয়ে থেকেছে সে দিঘির ধারে সিঁড়ির ধাপে। সেই স্বচ্ছ জলে মা, ঠাকুমা, জেঠিমাদের এপার-ওপার করার গল্প শুনেছে শুধু। মদনমোহন বাড়ির সামনের চওড়া রাস্তা জুড়ে রথ চলেছে। মোটা দড়ি টানছে সকলে। অপূর্ব রথসজ্জায় পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, উপরে পদ্মাসনে বসে মদনমোহনমূর্তির সামনে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। শুধু রথের দড়িটুকু একটু ছুঁয়ে দেবার জন্য।

ছোটরা কেউ এসেছে আষাঢ়ের অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজে, দাদু, ঠাকুমা বা দিদিমা, দাদার হাত ধরে রথ দেখবে বলে। ছড়ানো রয়েছে জিলিপি আর লটকার দোকান। ও দুটো জিনিস সে সময় এবং উলটো রথে কেনা চাই-ই। ওই রাস্তার ভিড়ে মদনমোহনকে ঘিরেই কোচবিহারের বিভিন্ন বাড়ির বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন সবই সম্পন্ন হয়। মেয়ে যাচ্ছে চলে শ্বশুরবাড়ি— মদনমোহন বাড়িতে নেমে পুজো, কালী মা, ভবানীমূর্তি, মদনমোহনকে প্রণাম ঠুকে তবেই শ্বশুরবাড়ির গাড়িতে ওঠা। নয়ত অমঙ্গল। বাচ্চা মেয়ের বা ছেলের জন্মদিন, স্নান সেরে, নতুন জামা পরে প্রথমেই মদনমোহনকে পুজো, তারপর বাড়ি ফিরে লুচি, মাংস, পায়েস, ডাল...।

এই মদনমোহনকে প্রাণে-মনে নিয়ে বেড়ে ওঠা কোচবিহারবাসী আজও মনে

করেন, রাসমেলায় প্রথম পা রেখেই 'রাসচক্র'টিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করা অথবা ঘুরিয়ে নিয়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাসমেলা ঘুরতে বেরনো। এটা বিশ্বাস বলুন, সংস্কার বলুন, ভক্তি বলুন, যা-ই বলুন, চলছে— আজও চলছে।

এইরকমই নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মদনমোহন নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। মাথা হেলিয়ে বাঁশি বাজানো মূর্তিটি কে বা কারা পাচার করে দিল, তার হদিশ আজও মিলল না। তদন্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ সংবাদপত্রে পড়ে আমাদের উদ্বেগ মেটাতে হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা মেটেনি আজও। নতুন মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আগের তুলনায় সামান্য বড়সড়। স্বাস্থ্যবান। মাথা সোজা করে সেই বাঁশি বাজানো মূর্তি আর মুকুট, পুরনো প্রিয়তম মদনমোহনমূর্তি আর সেই বাঁশির সুরে অভ্যস্ত আমাদের ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তাই পুরানো মদনমোহনমূর্তি ফিরে না পাওয়ায় আমার মতো অনেকেরই মন খারাপ।

এই মদনমোহন বাড়িকে কেন্দ্র করেই মূলত রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে চলে শুধু উত্তরবঙ্গ কেন, দক্ষিণবঙ্গ, এমনকি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তর মেলা রাসমেলা। এত বড় এলাকা, আর এত বড় মাঠ জুড়ে ওই মেলা বসে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য অন্যান্য জায়গার অনেকেই নাক সিটকে বলে, মেলার আবার নতুন ধরন, পুরানো ধরন, বিশেষত্ব কী—সবই ওই এক। কোনও মেলা বড়, কোনওটি ছোট—এ আবার নতুন কী! কিন্তু কোচবিহারের রাসমেলায় যাঁরা আসেন, বিশেষ কিছু দেখবেন, বিশেষ কিছু পাবেন বলেই। তাঁরা মেলার অন্তরের রত্নটুকু আলগোছে তুলে নেবেন মনের মণিকোঠায়। আর কোচবিহারবাসীর কথা তো আলাদাই। আগেই বলেছি, এ মেলা বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধনক্ষেত্র। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রকমারি জিনিসে বাজার ভরে যায়। ছোট্ট শিশুর প্রয়োজনীয় খেলনাটুকু থেকে, বড়দের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে, নানা মানুষের নানান চাহিদা পূরণ করে চলেছে এতগুলো যুগ পেরিয়ে। এ যেন সব পেয়েছির আসর।

কার্তিক-অঘ্রানের নবান্নের গন্ধে ছাত্রছাত্রীরা দিন পনেরো থেকে কুড়ি পেরিয়ে এই মেলার মাঝখান দিয়ে পাকা চওড়া রাস্তা ধরে স্কুল-কলেজে যাতায়াতও করে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে স্কুল পালিয়ে মেলার প্রাঙ্গণে ঢোকার অভিজ্ঞতা বোধহয় আমার মতো অনেকেরই আছে। আবার বৃহত্তম মেলার কোন কোণে কে যে হারিয়ে যাবে, সে ভয়ও বুকের মাঝবরাবর লেগেই থাকত। মেলায় মাঝদুপুরে যেমন আশপাশের গ্রামগঞ্জের

রোজ সকাল থেকেই ভিড় জমে রাসমেলায়।

মেলার অন্যতম আকর্ষণ বিখ্যাত ভেটাগুড়ির জিলিপি

পবনপুত্র হনুমান সম্ভবত মেলা পাহারার দায়িত্বে

স্থানীয় হস্তশিল্পের পসরা

সাবেকি কাঠের খেলনা মেলে এই মেলাতেই

মূর্তিটির সঙ্গে দুর্গার মিল থাকলেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ অনুপস্থিত। বামে জয়া আর দক্ষিণে বিজয়া। দশভুজা দেবী বাঁয়ে সিংহ এবং ডান দিকে বাঘের উপর অবস্থিত।

লোকেদের ভিড় কিংবা ভুটান-আসাম বর্ডারের লোকজনদের ভিড় হত তেমনি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকত।

মেলা ঘিরে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সেই ছোট্টবেলা থেকেই সার্কাস। পৃথিবীর নামকরা সব সার্কাস ওই মেলায় আগে থেকেই তাঁবু গাড়ত। আমাদের সময়ে এমন সব আধুনিক খেলা আমরা দেখেছি, এমন সব পশুপাখির খেলা দেখেছি, যে এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো টিভির পর্দায় বিদেশি, এ দেশি ট্রাপিজের খেলা থেকে শুরু করে অন্যান্য খেলা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে না আমাদের। যত বড় এবং যত নামী দল, তত সুন্দরী খেলোয়াড়ের আকর্ষণ। সেই সময় অর্থাৎ সাতের দশক জুড়ে নামীদামি ট্রাপিজের খেলোয়াড় বা হাতির কসরত দেখাতে অভ্যস্ত সুন্দরী মহিলা ও তাদের জমকালো পোশাক দেখে দর্শক আসনে বাবা-মায়ের পাশে বসে থাকা কত কিশোরী যে আমার মতো মনে মনে তাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান ছকে নিত। ওইরকম বিদুষী, রূপসি, সার্কাস খেলুড়ে হয়ে ওঠাই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। আর প্রতিটি খেলা শেষে অপরূপ মাদকতায় হাত নেড়ে মিষ্টি হাসি উপহার দেবেই সে দর্শকদের। বহু আগে থেকেই 'হাতি মেরে সাথি'র সেই ট্রেইনড হাতির নানা কারসাজি, মজাদার খেলা আমরা চক্ষু ছানাবড়া করে স্রেফ গিলে নিতাম। মনে হত, আমিও ওদেরই একজন। তবে কালচক্রে যত বড় হয়েছি, প্রতি বছর সার্কাস দেখেছি, কিন্তু আনা-নেওয়াতেও অনিয়ম এসেছে। সেই সঙ্গে সার্কাস দলগুলোর সুনামও এখন আর আছে বলে মনে হয় না। আসলে পরবর্তী বছরগুলোয় খেলা দেখে তেমন আনন্দ পেতাম না।

রাসমেলার মুখ্য আকর্ষণ মদনমোহন বাড়ি নিজেই। কোচবিহারের রাজাদের কুলদেবতা মদনমোহন। এটা ভাবতেই ভাল লাগে, কারণ আমি এক বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বা কৃষ্ণভক্ত বাড়ির সন্তান। সেখানে সন্ধে নামতেই ঠাকুমার মুখে কৃষ্ণর অষ্টোত্তর শতনাম আর লাল শালু মুড়িয়ে রাখা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত খুলে পাঠ করা শুনে শুনে বেড়ে ওঠা। আবার কীর্তনোৎসবে জেঠুর সুন্দর সুরেলা গলার কীর্তন শুনেও নিজের কণ্ঠে উঠে এসেছিল সুর। মদনমোহন বাড়ির সঙ্গে সংযুক্তিকরণ তাই আত্মিক। একান্তই আপনার। একসময় এই মন্দির ছিল রাজবাড়ির সীমানায়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ বৈরাগী দিঘির উত্তর পাড়ে ৭ বিঘা ১৩ কাঠা জমির উপর ওই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ওই মদনমোহনমূর্তি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মতো এটিও বাংলা চারচালার অনুকরণে চারকোনা ঘরের বাঁকানো কার্নিশের উপর গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত। পাশাপাশি আরও চারটি ঘর থাকায় দালানমন্দিরের প্রভাবও রয়েছে। মদনমোহনের ঘরের উপরেই প্রধান গম্বুজটি স্থাপিত। তার উপর পদ্ম, কলস, আমলক প্রভৃতি পরপর সাজানো আছে। মন্দিরের সামনে সমতল ছাদের বারান্দা। প্রবেশদ্বারের শীর্ষে নহবতখানা। ওই নহবতখানা সেই শিশু বয়স থেকে বারবার টেনে নিয়েছে সুরের মূর্ছনায়। মদনমোহন ঠাকুরের ঘরের দু'পাশে শ্বেতপাথরে শায়িত মহাকালের উপর দাঁড়ানো কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূল মদনমোহন মন্দিরের পুব দিকে খানিকটা হেঁটে গিয়ে ইটের তৈরি চারচালার উপর গম্বুজ, পদ্ম, কলস, আমলক শোভিত দেবী ভবানীর মন্দির। রুপোর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেবী ভবানীর মূর্তিটি মাটির তৈরি আর রং তার লাল। মূর্তিটির সঙ্গে দুর্গার মিল থাকলেও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ অনুপস্থিত। বামে জয়া আর দক্ষিণে বিজয়া। দশভুজা দেবী বাঁয়ে সিংহ এবং ডান দিকে বাঘের উপর অবস্থিত। ওই মূর্তি অনেকটাই বড়দেবী বাড়ির দুর্গামূর্তির সঙ্গে মিলে যায়।

আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনেছি, ওই মূর্তি মহারাজার স্বপ্নে পাওয়া। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, ভবানী দেবীর মন্দির চাতালে বড়রা পুজো দিতে এলেও বারান্দায় বিশেষ উঠতেন না। কারণ, উঠলেই সাত পাক ঘুরতেই হত। আর সাত পাক ঘুরব বলেই আমি উঠে পড়তাম সে বারান্দায়। কারণ, মন্দিরের পিছনের রহস্যময় বাগান আমাকে বড় টানত। নাম-না-জানা প্রচুর ফুল, বড় বড় গাছে ভরা সেই ভবানী মন্দিরের আকর্ষণ এখনও মনের ভেতর লালন করি। এত কথা বলার কারণ হল, 'রাসমেলা' বলতেই চোখ বুজলে শুধু মদনমোহন নন, তাঁকে ঘিরে নতুন করে সেজে ওঠা ছোট ছোট টিনের আর কাঠের কুটিরগুলো আমার বেড়ে ওঠার সম্পদ। প্রত্যেকটি কুটীরে নতুন করে বানানো শৈল্পিক বিভিন্ন মূর্তি এক একটি পুরাণ কাহিনি ব্যক্ত করে। পুরো কৃষ্ণ উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি অবলম্বন করে মদনমোহন বাড়ি জুড়ে পুরাণের জলছবি চোখের সামনে সচল হয়ে উঠত। তাদের জন্য নির্দিষ্ট সব ঘর। আর সব মূর্তির নিচে তাদের কার্যাবলি বিধৃত। কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত পুরাণ গ্রন্থ থেকে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণের জায়গাটিতে বিপুলকায় 'পূতনা' রাক্ষসীর মূর্তি। ওই রাক্ষসী মানবীর ছদ্মবেশে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসে নিজেই ছোট্ট কৃষ্ণর কারসাজিতে প্রাণ হারায়। ওইরকম বিপুলকায় পূতনার লাল পোশাক, আদুল গা দেখে কে না শিশুবেলায় ভয় পেয়েছে! আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ঠিক তার দশ পা দূরেই রাসচক্র। সেটাতে হাত ছুঁয়ে পুণ্য অর্জন করতেই হবে। তাই আড়চোখে ওই বিশাল পূতনাকে মায়ের শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে লক্ষ করেছি, যতবার গেছি। তবে সেই প্রাচীন যুগই ভাল ছিল... তেমন হা-হুতাশের দলে আমি না থাকলেও সে সময়ের কথা বলতেই হয়।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের তৈরি মূর্তিগুলি যেন শিল্পীর হাতে প্রাণ পেয়ে জ্বলজ্বল করত। তাদের চেহারাতেই লাস্য, কারুণ্য, বীর্যবত্তা, দার্ঢ্য ফুটে উঠত। শিশুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেই জেনে যেত পুরো রামায়ণ-মহাভারত বা কৃষ্ণ উপাখ্যান, প্রহ্লাদ কাহিনি। হায়! এখন আর মূর্তিরা সে কথা বলে না। বাঙ্ময় হয়ে ওঠে না। ঘাম-তেলে ঝকঝক করে না শিল্পীর সুষমা। অর্থাৎ প্রাণ পায় না। কোনওরকমে দায়সারা গোছের মূর্তি বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। রঙেরও জৌলুস যেন মরে গিয়েছে। বিপুলকায় 'পূতনা'ও আর তেমন ভীতি উদ্রেককারী রূপে প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে না। আসলে হয়ত দেখার চোখও বদলে গিয়েছে খানিকটা। তবে সবটুকু করায়ত্ত করে, সব শিখিয়ে-পড়িয়ে গড়ে তোলা এক কন্যে রাসমেলার মাধুর্যটুকু ত্রিশ বছর পর নতুন করে উপলব্ধি করছি আর ফিরে ফিরে দেখছি আমার অতীতকে।

রাসমেলা মানেই বার্ষিক পরীক্ষা দরজায় করাঘাত করছে। বাড়িতে পড়তে বসা মানে খোলা জানলা দিয়ে রাসমেলার জমজমাট সেই রাজকীয় মাইকের শব্দ ভেসে আসা মিলিত-মিশ্রিত, রকমারি আওয়াজ ভেসে আসা বাতাসে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া। আর মন পড়ে থাকা রাসমেলা ময়দান ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে যে কতবার। তখন হাতে গোনা তিন দিন বরাদ্দ ছিল আমার জন্য। একদিন মা-র সঙ্গে মেলায় বেরিয়ে পড়া। গিজগিজে ভিড়ে কখনও হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে কাকুর কাঁধে চেপে বসা কিংবা মা-র হাত ধরে থাকা শক্ত করে। অন্য একদিন চুড়ি, মালা, খেলনার লোভে ঘ্যানঘেনে জেদে বড়দের হাত ধরে

মেলা প্রাঙ্গণ। আবার একটু বড় হতেই এক মামার সঙ্গে বাড়ির ছোটরা মিলে 'টকিং ডল' শো দেখতে যাওয়া। অথবা 'নীরা' রেস্টুরেন্টে কাটলেট খেতে দাদার পিছন ধরা। আরও একটু বড়, যখন বুঝতে পারছি নারী-পুরুষ সম্পর্ক, তখনই সার্কাসে মায়ের সঙ্গে প্রবেশদ্বারের লাইনে দাঁড়িয়ে অসভ্য পুরুষদের নানা অছিলায় শরীর ছুঁয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করেছি। তবে সার্কাসের তাঁবুর ভেতর নীলচে আলোর অনুভূতিতে সাদা পোশাকের খেলোয়াড়দের শূন্যে ট্রাপিজের খেলায় বারবার মুগ্ধ হয়েছি। এখনও হই। রাসমেলায় মাঠের মাঝবরাবর নাগরদোলায় চরম আকর্ষণ ছিল বন্ধুদের। সেটা আর এ জীবনে আমার চড়া হল না। বাবার নিষেধ ছিল বরাবর। ভয় পেতেন, আমার যদি কিছু হয়ে যায়!

আর এক আকর্ষণের জায়গা গড়ে উঠেছিল রাসমেলায়। সেটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ। আমি তখন একাদশ শ্রেণি। আমার ছোটদের দল ছিল একটি। নাম 'ঝিলমিল'। সে বয়স থেকেই বাবার মতো সংগঠন গড়ে তোলা। খেলাচ্ছলেই পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা পেয়েছি মায়ের, বাবার। মনে আছে, কোনও এক বছর রাসমেলা মঞ্চে 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটকটি করিয়েছিলাম। আবার কোনও এক বছর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। সেসব কথা মনে এলে আমার বেড়ে ওঠা আর আমার কোচবিহারের মাটির কথা বাতাসের মতো জড়িয়ে যায়। তারপর কলেজ। রাসমেলার মাঝখান দিয়েই আমাদের চলন, বলন, ঘুরন, নাচন সব কিছু। আবার রাসমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পচা দুর্গন্ধযুক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে অসহ্য যন্ত্রণা হত।

গত বছর রাসমেলায় টানা ছ'-সাত দিন ধরে একনাগাড়ে বেরিয়েছি। ঘুরেছি মনের সুখে বাধাবন্ধনহীন। একই রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা ধরেছি বারবার। কিনেছি, পেয়েছি যা কেনার কথা ছিল না, যা পাওয়ার কথা, তার চেয়েও বেশি। রাসমেলার বিস্তৃতি ঘটছে। কত জায়গার রকমারি দোকানে কত সব জিনিসের ভিড়, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব ভেবেই পাই না। বুঝি, বুকের ভেতর বাস করছে সেই ক্লাস থ্রি-র বা ক্লাস সেভেনের মেয়েটাই, যার বয়স বারো বা চোদ্দোর পর আর বাড়েনি। সেই একই আনন্দে গেয়ে উঠতে পারি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...'। শুধু শারীরিক অনুভূতিতে হারিয়েছি আমার বাবার উপস্থিতি, মায়ের সাহচর্য। কিন্তু সুনীতি দিঘি বা বৈরাগী দিঘির পাশ দিয়ে আবছা অন্ধকারে যখন হেঁটে যাই, মায়ের আঁচলের গন্ধ আমাকে নিয়ে হেঁটে যায়, যেখানে আমি যেতে চাই। বৈরাগী দিঘির জলে আমি এখনও দেখি কোনও কিশোরীর সাঁতরে এপার-ওপার করার ছবি। আমি ইচ্ছেমতো কখনও নেপালি সাজসজ্জায় কিংবা উত্তরপ্রদেশের কোনও সাজে কিংবা রাজস্থানি ঘরানায় সেজে উঠে বলি, 'হে পৃথিবী, তাকিয়ে দেখো এ মেলার বিশিষ্টতায় লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের মতোই বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্যের ছবি।' নিজেকেও একলা মনে হয় না। মনে করি না। ওই লাল ইটের আনাচকানাচে মদনমোহন বাড়ির নহবতের সানাইয়ের মূর্ছনায় এক অন্যরকম মেয়ে মেলার বিরাট চৌহদ্দির মধ্য থেকে শুধু ভালটুকু নিতে জানে। হেঁটে যায় ঝকঝকে চওড়া রাস্তা ধরে।

নিয়মমাফিক পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। রাসপূর্ণিমার সন্ধেয় বা রাতে জেলা সমাহর্তার হস্তক্ষেপে উদ্বোধন ঘটে রাসমেলার। ওই নিয়মেই মদনমোহন বাড়ির পাকা চাতালে কথকতার ভঙ্গিতে পালা কীর্তন চলে, যাত্রা চলে প্রতিদিন। এই মেলাকে পাশে রেখেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নানা ভূরিভোজ, রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে যজ্ঞ শুরু হয়। আলোর জৌলুস, রকমারি নাগরদোলা আর নানা মানুষের ভিড় আজও বেড়েই চলেছে। কিন্তু মদনমোহন বাড়ির চিরাচরিত নহবতখানার সানাইয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। যান্ত্রিক সুর কেমন যেন করুণ, হৃদয়বিদারক মনে হয়। কী যেন হারিয়ে ফেলেছি। সেই হলুদ বনে অজস্র ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণে হারিয়ে যাওয়া নাকছাবিটা খুঁজেই চলেছি আমি। এখনও সুতোয় বাঁধা দশ টাকার মাটির চাকার লাল টমটম গাড়িটা টেনেই চলেছি আমি। শুধু রাস্তা বদলে গিয়েছে আমার, আমার প্রিয় শহর আমাকে টেনে নিয়েছে, বেঁধে দিয়েছে আর এক প্রিয় ঠিকানায়।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

সর্না

কোচবিহারের রাজ আমলের অনন্য একটি নিজস্ব প্রথা। যে কোনও জাতির মহত্ত্বের পরিচয় নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে। কোচবিহারের রাজশাসনে আমরা দেখেছি, গৃহস্থ দরজা বন্ধ না করেই ঘুমাতে পারত। আমি ছোটবেলায় বাবার পাশে ঘরের বাইরে বারান্দায় ঘুমিয়েছি গরমকালে। দরজা খোলাই থাকত। আজ এগুলিকে কল্পকথা মনে হবে।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকে এ রাজ্যের মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি সুন্দর প্রথা প্রচলিত ছিল। কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রা একটি বিখ্যাত উৎসব। আজকের মতো সেদিনও আসাম থেকে তীর্থযাত্রী আসত। তখন সমাজ রক্ষণশীল ছিল। বাড়ির মহিলাদের ইচ্ছামতো ভ্রমণের অনুমতি ছিল না। বিশেষত গ্রামীণ মহিলারা পরপুরুষের মুখ দেখত না। অথচ রাসযাত্রায় মদনমোহন দর্শন ও রাসমণ্ডল ঘোরানো একটি অবশ্যকর্তব্য ছিল। তাই মহারাজা একটি অনন্য প্রথা প্রচলন করেছিলেন— 'সর্না'। পূর্ণিমার পর চতুর্থ দিন হত 'সর্না'। সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত ঠাকুরবাড়িতে শুধুমাত্র মহিলাদের প্রবেশাধিকার থাকত। ঠাকুরবাড়ির পক্ষ থেকে যে কর্মসূচি প্রচারিত হত, সেখানেই সর্নার দিনক্ষণ বিজ্ঞাপিত হত। সেদিন চারদিকে পুলিশ পাহারায় কেবল মা, দিদিমা, ঠাকুমা, পিসিমা, তরুণী কন্যা এবং শিশুরা ঠাকুর দর্শন করত। ঠাকুরবাড়িতে কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকত না। ঘোমটা খুলে মহিলারা প্রাণ ভরে রাসের পুতুল, পূতনা রাক্ষসী এবং রাসমঞ্চ দেখতেন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরুর আগেই তাঁদের প্রস্থান করতে হত। বছরে একবার স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারার আনন্দে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। আশ্রম থেকে আসতেন মহিলারা সর্নার দিন ঠাকুরবাড়িতে। সুনীতি অ্যাকাডেমি অর্ধদিবসে ছুটি হত। ছাত্রীরা দল বেঁধে ঠাকুর দেখত।

নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত স্বাধীনতার পরও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ফলে মেয়েদের আর আলাদা করে কোনও বিশেষ দিনে ঠাকুর দর্শনের আবশ্যকতা রইল না। সর্নায় মেয়েদের সংখ্যা কমতে লাগল। ফলে দেবত্র বোর্ড মিটিং করে ওই প্রথা রদ করে দেওয়া হল। গোপালকিশোর রায় যখন দেবত্র বোর্ডের সেক্রেটারি, তখন ওটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১-৭২ নাগাদ।

সর্না শব্দের অর্থ কী? আমার নিজস্ব একটা ধারণা হল, অভিধানে 'শর্ম' (ফারসি) শব্দটির অর্থ শরম বা লজ্জা। লজ্জাবতী মহিলাদের জন্য একক এই প্রথাটির নাম হয়ত ছিল শর্মা। অর্থাৎ লজ্জিত। পরবর্তীকালে উচ্চারণ শৈথিল্যে শব্দটি সর্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে আরও বেশি আলোকপাত যদি কেউ করতে পারেন, তবে তাঁকে স্বাগত জানাই। আজ সর্না ইতিহাস, কিন্তু কোনও ইতিহাসের পাতায় তার উল্লেখ পাইনি। আজ সেই চলে যাওয়া দিনটির স্মৃতিচারণ করে তাকে লিপিবদ্ধ করবার দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমিকে প্রণাম জানাই।

সবিতা দেবী

রাধিকাবিহীন রাসলীলায় বেশি গুরুত্ব পায় মানুষের মিলন উৎসব

'বর্তমান জার্ম্মান যুদ্ধ— যাহাতে হিটলার, চার্চ্চহিল, মুসোলিনি প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবেন। স্মরণ রাখিবেন শ্রীশ্রী মহারানি সাহেবা ও শ্রীশ্রী মহারাজা ভূপবাহাদুর ও বড় সাহেবের শুভাগমন এই নিউ সিনেমাতে হইয়া থাকে। মফঃস্সলবাসীদিগকে থাকিবার স্থানও দেওয়া হয়।...' (রাসমেলায় টকি —) আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে কোচবিহার রাসমেলায় বায়োস্কোপ দেখানোর বিজ্ঞাপনের কথাগুলি ছিল এইরকম। বিগত শতকের তিনের দশক থেকেই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল বায়োস্কোপ। গ্রাম-মফস্সলের যে কোনও শ্রেণির যে কোনও স্তরের মানুষ সেদিন মেলায় ঢুকেই বায়োস্কোপের খোঁজ লাগাত। সব বদলে গিয়েছে আজ। গ্রাম-শহর-মফস্সল, মানুষ, এমনকি দেশ-বিদেশ-পরিজন-পরিবেশ সব। কোথাও ফাঁক রাখেনি সেই বদলে যাওয়া। কোথাও সোজা, কোথাও বাঁকা, কখনও উপরে, কখনও নিচে সর্বত্র বদল ঘটছে। নভেম্বর মাসের শেষ, তাও ঘামছি দরদর করে। অকালের বৃষ্টিতে শহরের পথঘাট জল থইথই। ঘরের ছেলেমেয়েগুলো মাতৃভাষায় কথা বলতে বিষম খাচ্ছে। গানবাজনায় এত কোলাহল, কান পাতা দায়। যুগের তাল কি তবে কেটে গেল, নাকি মেলাতে পারছি না নিজে? কিন্তু বাকি সবাই যে বদল মেনে নিচ্ছে, তাও তো নয়। সব বদল মেনে নেওয়াও যায় না। সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য— এর পরিপন্থী বদল সব মানুষ মেনে নিতে পারছে কই? তাই কেউ কেউ কথা বলছে। সবাই নয়, খুব জোরেও নয়, তবু তো বলছে।

মেলায় রেডিয়ো, কলের গান, বায়োস্কোপ নেই। তার বদলে ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্টফোন, প্লাজমা টিভি এখন। হাতে টানা নাগরদোলার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। এসে গিয়েছে যন্ত্রে চলা মেরি গো রাউন্ড। সার্কাস চলছে বটে, কিন্তু বাঘ-সিংহ-হাতিবিহীন খেলা কি আর আগের মতো পাবলিক টানতে পারছে! মরণ-কুয়া, নাগিনি কন্যা, কেজি কেজি কাঁচা শাকসবজি খেয়ে ফেলা বৃকোদর, তারাও আছে, তবে বদলে গিয়েছে অনেকটা। দাদের মলম, বাতের মালিশ, কাঠের ফার্নিচার, কাশ্মীরি শাল সবই আছে। আর ভেটাগুড়ির জিলিপি— তাও মিলবে। তুফানগঞ্জ থেকে

সপরিবারে যে কৃষক ফি-বছর মেলায় আসত গোরুর গাড়ি করে, সারারাত মেলায় ঘুরে কেনাকাটা, পরের দিন বাড়ি ফেরা। সেদিন মেলা থেকে বাড়ি যেত গোরুর গাড়ির চাকা, জোয়াল, ছাতা, কম্বল, লোহার কড়াই, সাঁড়াশি, চাটু, মেয়েদের চুড়ি, ডুরে শাড়ি, সাবান, স্নো, মাথায় দেওয়ার গন্ধ তেল— আরও বহু কিছু। ওই কৃষকের নাতি এখন মাথাভাঙা প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরি করে। সেও তার পরিবার নিয়ে রাসমেলায় আসে হিরো হন্ডা চেপে। তার খোঁজে থাকে মেলায় বিনা সুদের কিস্তিতে একটা চারচাকা গাড়ি পাওয়া যায় কি না। তার মানে মেলাও বসে, সেই মানুষও আসে, ঘটে চলে কেবল বদল।

বদল যতই ঘটুক না কেন, কোচবিহারের রাসমেলা অতীতেও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। তার জনপ্রিয়তা এতটাই যে বাংলা ছড়ায় তার পরিচয় মেলে এভাবে— বলরামপুরের বাঁশ, কোচবিহারের রাস। তুফানগঞ্জের বলরামপুরের বাঁশের কদর আজ হয়ত তলানিতে, কিন্তু গোটা উত্তরবঙ্গ কেন, কোচবিহারের রাসমেলা সারা পশ্চিমবঙ্গে যত প্রাচীন মেলা আছে, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত কোচবিহার রাসমেলার প্রচলন করেছিলেন রাজারা। উদ্ভবগত বিচারে সেই মেলা একটি ধর্মীয় মেলা তো অবশ্যই। কিন্তু মেলার গায়ে ধর্মীয় ছাপ্পা দাগালে তার্কিক থেকে ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী থেকে বিদগ্ধজন, যে কেউ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেই পারেন। তবু তাঁদের না মেনেও উপায় নেই। কারণ, শ্রাবণ পূর্ণিমায় যেমন ঝুলনযাত্রা, কার্তিক পূর্ণিমায় তেমনই রাধাকৃষ্ণর লীলা সংবলিত একটি উৎসব হল রাসযাত্রা। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক সাধনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই পালনও আবশ্যক। সংশয়াতীতভাবে হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল কোচ রাজপরিবার। রীতিনীতি, আচার-আচরণেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা বা ভক্তিতে কোনও ফাঁক ছিল না। একদিকে শক্তিদেবী ভবানী বা ভগবতীর উপাসনাও যেমন তাঁরা করতেন, অন্যদিকে বাণেশ্বর, সিদ্ধনাথ, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির নির্মাণ করে নিত্যপুজোর আয়োজনও রেখেছিলেন। শাক্ত ও শৈব— দুই ধর্মের প্রতি কোচ রাজবংশের আনুগত্য সন্দেহাতীতভাবেই স্পষ্ট। কিন্তু এর পরও মনে রাখা দরকার যে, কোচবিহার রাজবংশের কুলদেবতা হলেন মদনমোহন। আর এই মদনমোহনকে ঘিরেই কোচবিহার রাসমেলা। রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলের আগে পর্যন্ত মদনমোহনের পুজো হত কোচবিহার রাজবাড়ির ভেতরেই। কিন্তু নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালেই ইংরেজরা পাশ্চাত্য প্রথায় প্রায় দশ লক্ষের বেশি টাকা খরচ করল রাজপ্রাসাদ তৈরিতে। সেই প্রাসাদে কী ছিল না! টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, লিলিপুল থেকে শুরু করে ছায়াবীথিতল— পাশ্চাত্য কায়দায় প্রায় সব ধরনের বিলাসব্যসনের ব্যবস্থা। কিন্তু সব আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা গেল, শুধু নেই কুলদেবতা মদনমোহনের থাকার জায়গা। এত কিছুর মাঝে সেইটুকুই কেবল বাদ পড়ে গিয়েছে। অগত্যা বৈরাগী দিঘির উত্তর ধারে রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ নির্মাণ করালেন মদনমোহন মন্দির। আর সেই মন্দিরের সামনে বৈরাগী দিঘির পাড়ে কার্তিক পূর্ণিমায় রাস উৎসবকেন্দ্র করে মেলা বসতে শুরু করল।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কোচবিহার রাজবাড়ির কুলদেবতা মদনমোহন। একই সঙ্গে রাস উৎসব উপলক্ষে রাসমেলার প্রাচীনত্ব নিয়েও সংশয় এবং বিতর্ক দুই রয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি কোচবিহার রাজপরিবারের বৈষ্ণবধর্মপ্রীতি নিয়েও যদি প্রশ্ন ওঠে সেটিও খুব একটা অসংগত নয়। যে রাজপরিবার শাক্ত

ও শৈব দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়ে নিষ্ঠা সহকারে তাঁদের নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই পরিবারই আধ্যাত্মিক বিচারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও পালনীয় উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন কেন? একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের সুযোগ্য পুত্র নরনারায়ণ থেকে শুরু করে সর্বশেষ রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ— এঁদের প্রত্যেকের (সর্বমোট কুড়িজন) নামের শেষাংশে নারায়ণ রয়েছে। নামের অন্তে দেবতা বিষ্ণু বা নারায়ণ নাম ব্যবহারে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, কোচবিহার রাজবংশের নৃপতিরা বংশপরম্পরায় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ওই কুড়িজন রাজার মধ্যে অনেকেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এ কথাও জানা যায় যে, রাজা নরনারায়ণের পুত্র

রাসমেলার ক'দিন মদনমোহন বাড়ি চত্বরে দেখা মেলে এমন রাধার। মদনমোহনের জন্য না হলেও পেটের জন্য তো বটেই।

লক্ষ্মীনারায়ণ আসামে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রচারক শংকরদেবের প্রবর্তিত ধর্মমতকে রাজধর্ম বলেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধক শংকরদেব অবশ্য তাঁর সাধনায় কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই অনুরাগী ছিলেন। চৈতন্যদেবের কাছে শ্রীরাধিকা হলেন কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তির মহোত্তম প্রকাশ। কারণ, গৌড়ীয় সাধনার মূলে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ যুগল উপাসনা। কিন্তু শংকরদেব বা তাঁর মতাবলম্বীরা অবশ্য শুধুই কৃষ্ণ-অনুরাগী ছিলেন। রাধিকার কোনও ভূমিকা ছিল না তাঁদের উপাসনায়। কোচবিহার রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহন রাধাবিহীন। একা মদনমোহনই রাজপরিবারের উপাস্য। তাহলে কোচবিহারের রাস উৎসব আর তাকে ঘিরে মেলার তাৎপর্য কী? বাংলা সনের সপ্তম মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ তিথিতে শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের মিলন উপলক্ষেই রাস উৎসব। অন্তত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত সে কথাই বলে। আর সেই কারণেই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের কাছে এই উৎসবের মাহাত্ম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই রাধাকৃষ্ণ উপাসকরা এই উৎসবকে পালন করে তাদের সাধনা রীতিতেই। কিন্তু কোচবিহার রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহন, তিনি তো শ্রীরাধিকাবিহীন। অন্যদিকে, যে শংকরদেবের প্রভাবে রাজপরিবার বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী, সেই বৈষ্ণবীয় সাধনাতেও শ্রীরাধিকার কোনও ভূমিকা নেই। ফলত, কোচবিহার রাসমেলাকে কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রেক্ষিত অথবা বৈষ্ণবীয় লীলা অনুষঙ্গে আজ বিচার করতে যাওয়া মস্ত ভুল।

জয়নাথ মুনশির 'রাজোপাখ্যান' থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে এই মেলা শুরু হয়েছিল। রাজা হরেন্দ্র কোচবিহার থেকে ভেটাগুড়িতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। ভেটাগুড়িতে রাজপ্রাসাদও নির্মাণ করান তিনি। তিনি শংকরদেবের ধর্মীয় প্রভাবে রাজবাড়িতে মদনমোহন প্রতিষ্ঠা করেন। কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে তিনি নতুন রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করেন এবং মদনমোহনের পুজো করেন। রাসযাত্রার দিন সেই উপলক্ষে রাসবাড়ি ঘিরে শুরু হয় রাসমেলা। পরবর্তী সময়ে রাসমেলার জায়গা বদল ঘটে। কিন্তু সেই একই প্রশ্ন এখানেও এসে পড়ে, রাধিকাবিহীন মদনমোহন নিয়ে কীভাবে রাসলীলা সম্ভব? তাহলে ধরে নিতে হবে, শংকরদেব ও তাঁর অনুরাগীরা বৈষ্ণবধর্মের যে সাধনায় বিশ্বাস করতেন তা শেষ পর্যন্ত লৌকিক ধর্মে রূপ নিয়েছিল। লৌকিক ধর্ম বেশির ভাগ সময়ই কোনও শাস্ত্রীয় আচার-বিচার, বিধিনিষেধ মেনে চলেনি। সাধারণ মানুষের নিজস্ব আচার-বিচারেই তা পালিত হয়। কোচবিহারের মদনমোহনেরও তেমনই শ্রীরাধিকা ছাড়া রাসোৎসবে মেতে উঠতে আটকায়নি। আর উৎসব ঘিরে মানুষের অংশগ্রহণ সে তো পারস্পরিক মিলনের কারণে। তাই রাস উৎসব উপলক্ষে মেলা বছর বছর ব্যাপ্তি পেয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ মেলায় ভিড় জমিয়েছে। বদলও ঘটেছে অনেক। কিন্তু সে বদল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

রাজ-অনুগ্রহেই যে এই মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, ধর্মীয় আনুগত্য থেকেই যে তার সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেসব কিছু ছাপিয়ে মেলার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। এখানে রাধাকৃষ্ণর মিলন কিংবা রাধিকাবিহীন মদনমোহনের ধর্মীয় ব্যাখ্যার থেকেও মানুষের মিলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে মেলার বাইরের চেহারার বদলের থেকেও লক্ষণীয় ব্যাপার হল তার যুগোপযোগিতা।

তপন মল্লিক চৌধুরী

রাসমেলার সব ছবি তুলেছেন সাত্যকি বিশ্বাস

আজও জেলাশাসক উপোস রেখেই উদ্বোধন করেন

সরকারি রীতি তাই জেলাশাসকের উপোস। এরকমটাই নিয়ম। বরাবর হয়ে আসছে। কারণ, এটাই প্রথা। একেই বলে ঐতিহ্য, পরম্পরা। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার পরিচালিত কার্যক্রম এখনও রাজনিয়মেই পালিত হয়ে চলেছে। রাজ-আজ্ঞা পালনই সেই অনুষ্ঠানসূচির সংস্কৃতি। কোচবিহার রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে কোচবিহার শহরের একটি বিরাট অংশ জুড়ে। দু'টি ভাগে চলে এই রাস উৎসব। একদিকে পুজোপার্বণ, নিয়মনীতি, আচার-অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। আর রাসযাত্রাকে ঘিরে রাসমেলা পরিচালিত হয় পুরসভার তত্ত্বাবধানে।

পাঁজির নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রাসপূর্ণিমার রাতে কোচবিহার মদনমোহন বাড়িতে যাগযজ্ঞ-আহুতি দিয়ে ইসলামধর্মে বিশ্বাসী শিল্পী আলতাফ মিয়ার তৈরি রাসচক্র ঘুরিয়ে রাসযাত্রার সূচনা করেন জেলাশাসক। রাজপরিবারের নিয়মানুসারে তাঁকে ওইদিন নির্জলা উপবাসে থাকতে হয়। সেইদিন তিনি রাজমর্যাদাও লাভ করেন। তাঁকে 'গার্ড অব অনার' দিয়ে মদনমোহন বাড়ি চত্বরে দেবদেবী দর্শন করানো হয়। ১৯৪৯ সালে কোচবিহার ভারতভুক্তির পর থেকে এরকমটাই হয়ে আসছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই রাসমেলা ঐতিহাসিক তথ্যের হিসাব অনুযায়ী ২০৩ বছরে পা দিল।

রাজ-আমলেই রাজদরবারের তত্ত্বাবধানে টাউন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির দায়িত্বে ১৯০৭ সাল থেকে মেলা পরিচালিত হত। ১৯৪৬ সালে মহারাজার সময়কালেই গঠিত হয় কোচবিহার পৌরসভা। তারপর থেকে পৌরসভাই এই মেলা পরিচালনা করে চলেছে। আর মদনমোহন বাড়ির রাসযাত্রা উৎসব পরিচালিত হয় কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড দ্বারা। রাস উৎসবে অন্যান্য মন্দির থেকে দেবতারা বেড়াতে আসেন এখানে। পক্ষকাল ধরে মদনমোহন বাড়িতেই বিশেষ পুজো হয় তাঁদের। প্রকৃত অর্থে সংহতি ও রথের উৎসব হল রাসোৎসব। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই মিলিত হয়। তাই মদনমোহন শুধু মন্দির নয়, বাড়ি— যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

গৌতমের মনসবদারিতে এবার ডুয়ার্সের হাতি হানা ?

একদা উত্তরবাংলার বনভূমি নাকি বনদেবতা দুই শক্তিধর জঙ্গলবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, যাতে এর অধিকার নিয়ে দাঁত ও নখের লড়াইতে জঙ্গলের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে রক্তাক্ত না হয়। তরাইয়ের বাঘ আর ডুয়ার্সের হাতি, কেউ কারও বিচরণভূমিতে প্রবেশ করবে না। প্রয়োজনে যদি একের রাজত্বে অপরকে ঢুকতেই হয়, তবে তারা মুখোমুখি হয়ে কেউ কারও অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে না।

তিস্তার পূর্ব পাড়ের এলাকা ডুয়ার্স আর পশ্চিম পাড় তরাই নামে পরিচিত। বনদেবতার মতোই এই দুই ভাগের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এখন যদিও আদতে গঙ্গার ওপারের রাজনৈতিক দেবতার হাতেই থাকে। কেবল মোগল সাম্রাজ্যের মনসবদারি প্রথার মতো রাজ্যের এই উত্তর ভাগের এক-একটি খণ্ডের জন্য একেকজন রাজনৈতিক মনসবদার নিযুক্ত হন। বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে উত্তরবঙ্গের মনসবদারিতে ছিলেন জলপাইগুড়ির খগেন দাশগুপ্ত। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সাম্রাজ্যে সেই মনসবদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মালদার গণি খান চৌধুরীকে। জ্যোতি বসুর শাসনকালে মনসবদাররা তেমন আমল না পেলেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্রাটের দণ্ড হাতে নিয়ে উত্তরবঙ্গের মনসবদার নিযুক্ত করেছিলেন শিলিগুড়ির অশোক ভট্টাচার্যকে। এর পর ক্ষমতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দায়িত্ব যখন গৌতম দেবের হাতে তুলে দিলেন, তখন প্রথম দিকে তাতে কোনও অসুবিধা দেখা যায়নি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পেয়ে যখন গৌতমবাবু মালদা থেকে কোচবিহার ঝড়ের গতিতে সফর করে একের পর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে চলেছিলেন, তখন মনের মধ্যে অনেকের প্রশ্ন জেগেছিল, যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন তা সব ক'টাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে আদৌ পড়ে কি না। কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্যে বলার কেউ ছিল না। কারণ মালদা থেকে কোচবিহার, মাঝখানে শিলিগুড়ি, ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ বাদ দিলে তৃণমূলের অবস্থা তখন গড়ের মাঠের মতোই শূন্য। মালদায় কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী অনেক পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন, রায়গঞ্জের অমল আচার্যেরও সেই ইতিহাস। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ কোচবিহারের রাজ্যপাটে সিংহ আর কাস্তে হাতুড়ির দাপট তখনও ম্রিয়মাণ হয়নি। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি তখনও কংগ্রেসের অধীনে। স্বভাবতই গৌতমবাবুর মনসবদারি তাই উত্তরবঙ্গে তখন একতরফা। যেমন ছিল বুদ্ধদেববাবুর আমলে অশোক ভট্টাচার্যর। সে সময় অশোকবাবু যেমন 'উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী'র বিশেষণে গর্বের হাসি তার গোঁফের তলায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও লুকিয়ে রাখতে পারেননি, তেমনই নয়া জমানায় গৌতমবাবুও তাঁর সম্পর্কে সংবাদপত্রের সেই বিশেষণে তৃপ্তির হাসি হেসে চলেছেন বেশ কিছুদিন ধরে। কিন্তু গোল বাধল তার পরেই।

আলিপুরদুয়ার থেকে জলপাইগুড়ি এসে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে সৌরভ চক্রবর্তীর যোগদানের পর দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকল। গত তিন বছরে উত্তরবঙ্গের এই একচেটিয়া মনসবদারিতে ঘটে গিয়েছে বিশাল পরিবর্তন। শাসকদল তৃণমূলের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ছড়িয়েছে ডুয়ার্সের সর্বত্র। বাম এবং কংগ্রেস, দলে দলে দুই বিরোধী পক্ষ থেকেই মানুষ যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। জার্সি বদল করেছেন নেতারাও। নিজেদের এলাকার ক্ষমতার রাশ আয়ত্তে রাখতে পেরেছেন তাঁদের কেউ কেউ। ফলে মনসবদারি ক্রমাগত খণ্ডিত হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যেটুকু জানি, মালদায় এখন নতুন মনসবদার কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, দক্ষিণ

> গৌতমবাবুর মনসবদারির সীমা থেকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু সেই রথের চাকার শব্দ দার্জিলিং জেলার জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকা তো বটেই, এমনকি শিলিগুড়িতে বসেও নাকি শোনা যাচ্ছে।

দিনাজপুরে মলয় ঘটক, উত্তর দিনাজপুরে মনসবদারি অমল আচার্যর দখলে, আর কোচবিহারের ইজারা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অন্যদিকে স্বল্প পরিসরেই ডুয়ার্সের রাজত্বে সৌরভ চক্রবর্তী তাঁর রথের চাকাকে প্রবল প্রতাপে যেভাবে পরিচালিত করছেন, তাতে গৌতমবাবুর মনসবদারির সীমা থেকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু সেই রথের চাকার শব্দ দার্জিলিং জেলার জলপাইগুড়ি সংলগ্ন এলাকা তো বটেই, এমনকি শিলিগুড়িতে বসেও নাকি শোনা যাচ্ছে।

যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গৌতম দেব গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন, সেই কেন্দ্রটি পুরোপুরি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পড়ে। জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে বলে ফেলেছিলেন, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীর নাম ঠিক করার দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়েছে। এই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নেতাসহ গৌতম দেব তার প্রতিবাদ করেছেন। সৌরভবাবুর এই বক্তব্য নিশ্চয়ই কোনও কথার কথা ছিল না। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর দলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্বের কাছ থেকে তেমন ইঙ্গিত পেয়েই বলেছিলেন। তাঁর ভুল ছিল এমন একটা রাজনৈতিক স্পর্শকাতর বিষয় প্রকাশ্যে জানিয়ে দেওয়া। তৃণমূল দলটি ক্ষমতার নেতৃত্বে আবর্তিত দল। এখানে নির্বাচনের আগে থাকতেই প্রার্থী হওয়ার জন্য নানা উপদল সৃষ্টি হয়ে যায়। সৌরভবাবু হয়ত ধরে নিয়েছিলেন, তাঁর ওপর এই জেলার বিধানসভার প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে— এটি জানার পর ক্ষমতার কেন্দ্রে আবর্তিত হওয়ার অভিলাষী তৃণমূল সদস্যরা তাঁর কাছে এসে তাঁদের আনুগত্যের শপথ নেবেন। উঁচু মহলের সঙ্গে তাঁর যে কথাই হয়ে থাকুক না কেন, এমন বিবৃতিতে যে দলের রাজ্য নেতৃত্ব বেকায়দায় পড়বেন, সেই সাধারণ কূটনীতিটি আবেগের আতিশয্যে সৌরভবাবু সম্ভবত মনে রাখতে পারেননি। নেতৃত্বের ধমক খেয়ে তাঁকে ঢোঁক গিলতে হয়েছে। সৌরভবাবুর এই বিবৃতি সিরিয়াস হিসেবে ধরে নিলে তার অর্থ— রায়গঞ্জ ব্লকের ডাবগ্রাম-১, ডাবগ্রাম-২, ফুলবাড়ি-১, ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শিলিগুড়ি পৌরসভার ৩১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসন থেকে গৌতমবাবু নির্বাচিত হয়েছেন, সেই আসনে আগামী নির্বাচনে গৌতমবাবুকে প্রার্থী হতে হলে সৌরভ চক্রবর্তীর মতামত গুরুত্ব পাবে। কারণ, এগুলি সবই জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত।

রাজনীতির আঙিনা তো এখন বাণিজ্যিক অঙিনার মতন। যার দাম দেবার ক্ষমতা আছে, তার হাতেই বাজার। জেলা সভাপতি হিসেবে সৌরভবাবু দু'টি সংসদই তৃণমূলকে উপহার দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি পুরসভা থেকে শুরু করে অধিকাংশ বিধানসভার আসনও নির্বাচনের আগে এবং পরে দলত্যাগ ঘটিয়ে দলের ঝোলায় ভরতে পেরেছেন। জলপাইগুড়ি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হয়েই ব্যাঙ্ককে লাভের মুখ দেখিয়েছেন। নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যবস্থা নিয়েছেন। গৌতম দেবের মূলধন যেখানে কেবলই রাজনৈতিক বাজারে ক্ষয় হয়ে চলেছে, তেমনই বৃদ্ধি পাচ্ছে তরুণ তারকা সৌরভের প্রতিপত্তি। রাশিয়া থেকে বাঘ ঢুকে পড়ায় ভারতে নিজের মাটিতে একদিন চরম কোণঠাসা ও প্রায় অস্তিত্বহীন হতে হয়েছিল সিংহকে। তরাইয়ের বিচরণক্ষেত্রেও ডুয়ার্সের এই উঁকিঝুঁকিতে রীতিমতো ত্রস্ত তরাইয়ের পুরানো শাসনতন্ত্র। সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল তাদের আরও সংকুচিত করেছে নিঃসন্দেহে। ফলে যতই ডুয়ার্সের দখলি পদচারণার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, ততই এলাকায় রাজনৈতিক চিত্রের যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, তার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অদূরেই ডুয়ার্সের হাতি দখল নিতে পারে তরাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। মনসবদারির দাবি নিয়ে মঞ্চে অদূর ভবিষ্যতে হাজির হতে পারেন ডুয়ার্সের নতুন তারকা সৌরভ চক্রবর্তী। তবে রাজনৈতিক ভাগ্য যে টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচের মতোই অনিশ্চিত। তাই একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বিশেষ সংযোজন

এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়ার সময় জানা গেল, মাননীয় মন্ত্রী গৌতম দেবের হার্ট সার্জারি সদ্য শেষ হয়েছে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্যই তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে ফিরতে হবে।

—**সম্পাদক**, 'এখন ডুয়ার্স'

কোচবিহারে কেবল নেটওয়ার্কে উন্নত পরিষেবা

উত্তরবাংলার প্রান্ত জেলাতেও শুরু হয়েছে কেবল ডিজিটাল করার কাজ। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল শুধুমাত্র আমূল পরিবর্তন নয়, এক নতুন বিপ্লব বলা যেতে পারে। ১৯৯০ সাল থেকে কোচবিহার জেলায় শুরু হয়েছিল এই পরিষেবা দেওয়ার কাজ। তারপর গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠা, যার নাম দেওয়া হয় সিকন। গড়ে ওঠা নতুন প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই হয়ে উঠল একটি পরিবার। শুধু বাংলাদেশ কিংবা ভারতীয় দূরদর্শনের অনুষ্ঠানই নয়, জেলার মানুষেরা পেলেন বেশ কিছু নতুন চ্যানেল দেখার সুযোগ। ওইসব চ্যানেলের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসাও ধীরে ধীরে প্রসারিত হল। কিন্তু প্রতিষ্ঠান ভেঙে গেল। ফলে দুর্বল হল সিকন। তবে ২০০৫ সালে তৈরি হল আরও একটি নতুন প্রতিষ্ঠান— সিএনসি বা কোচবিহার নেটওয়ার্ক কেবল। এই সংস্থারও বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটল বেশ ভালরকম। ক্রমে কেবল পরিষেবা থেকে ডিশ অ্যান্টেনার দিকেই ঝোঁক দেখা দিল। পাশাপাশি এল নতুন সংস্থা তারাও দখল করল ডুয়ার্সের বাজার। ইতিমধ্যে সেট টপ বক্স নিয়ে নতুন ফরমান জারি হল। সিকন ওই পরিষেবা নিয়ে হাজির হল কোচবিহারে। উন্নত ওই পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায় ২০১৫ সালের ৩১ অগাস্ট। খুব শীঘ্রই সেট টপ বক্স গ্রাহকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ করে ফেলবে সিকন।

ডুয়ার্স উৎসব ? নাকি আলিপুরদুয়ার উৎসব ?

নামে যথেষ্ট গালভারী। বয়সও হল বছর এগারো। অথচ কলকাতার পর্যটকদের অভিযোগ, তাঁরা ডুয়ার্স ভালবাসেন, কিন্তু এরকম একটা উৎসবের ঠিকুজিকুষ্ঠি কিছুই জানেন না। জানার উপায়ই বা কোথায় ? উৎসবের কোনও অফিশিয়াল ওয়েবসাইটও যে খুঁজে পাওয়া যায় না ! প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারের পর্যটন-সচেতন মানুষকে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে, এরকম একটা কিছু হয় শুনেছি, কিন্তু ঠিক কবে হয় জানা নেই। ডুয়ার্স নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও ডুয়ার্স উৎসব বলে কোনও মেলা বা অনুষ্ঠানের নাম শোনেননি মালদা বা দিনাজপুরের অধিকাংশ মানুষ। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ডুয়ার্স উৎসব বারো বছরে পা দিয়ে সত্যিই কতটা সার্থকতা পেয়েছে ?

জৌলুস বা চটকদারি দিয়ে কি কোনও উৎসব বা মেলার জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায় ? একটু ভাবলেই বাংলায় এমন অনেক মেলা বা উৎসবের নাম মনে আসে, যেগুলি রমরম করে দীর্ঘদিন চলেছে অথচ একদিন পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও সত্যি, হাজার পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও যখন একটি মেলা বা উৎসবের প্রকৃত জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন তার কারণ বার করাটা সত্যিই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। একটা সময় হলদিয়ায় সেখানকার তৎকালীন অবিসংবাদী 'রাজা'-র শখের উৎসব চলত মহা ধুমধামে, অনেকটা রাজসূয় যজ্ঞের মতো। বছরের পর বছর সেই মেলার দিকে তাকিয়ে থাকত বহু স্বার্থান্বেষী মানুষ, কয়েকটা দিনেই আমদানি হত লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে রাজছত্র ভেঙে পড়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে সেই বিখ্যাত উৎসব। পুরানো কাগজ খুঁজলে এরকম আরও দু'চারটে উৎসব বেরিয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে। আজ বারো বছরে পা দিয়ে আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে কিন্তু তাই সংশয় জাগে, অন্তত আলিপুরদুয়ারবাসীর মনে তো বটেই।

শুরু থেকেই এই উৎসবেরও ছিল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং পাশাপাশি আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা। মূলত পাহাড়-নদী-অরণ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ ডুয়ার্সের পর্যটন আকর্ষণকে আরও বেশি করে দেশ তথা দুনিয়ার সামনে হাজির করা, এক কথায় পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসার ছিল প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি জনজাতি অধ্যুষিত ডুয়ার্সের শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকেও প্রচারের আলোয় এনে ছড়িয়ে দেওয়া, আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছুরই

প্রসার, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনাই ছিল ডুয়ার্স উৎসবের উদ্যোগে। উৎসবকে আকর্ষণীয় করাটা জরুরি, সেইমতো তার কর্মসূচি সাজাতে বিনোদনমূলক আয়োজনেও ফাঁক থাকেনি উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে, সে কথা বলতেই হবে। তা না হলে এগারোটা উৎসব সম্পন্ন হল কীভাবে ! কিন্তু আয়োজন বা উদ্যোগ বছরের পর বছর পার হওয়া মানেই কি সেই উৎসব সার্থকতা পেয়েছে তার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ? ত্রুটিমুক্ত আয়োজন কিংবা চটক আকর্ষণ বাড়াতেই পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই উৎসব সর্বজনীন কিংবা যে কারণে উৎসব-ভাবনা তার বেশ খানিকটা সফল হয়েছে। এবারের ডুয়ার্স উৎসবের প্রাক্কালেই কিন্তু আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন মানুষের মুখে ওই উৎসব নিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল।

গোড়াতেই গলদ দেখছেন শহরের বুদ্ধিজীবী মানুষ। যে বছর প্রথম সূচনা হয় সেবারই ঠিক হয়েছিল বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় হবে এই উৎসব। যাতে কয়েক বছরেই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দু'এক বছর চলার পরই সেই নিয়ম আর মানা হচ্ছে না। গত পাঁচ বছরের রেকর্ড বলছে— ২০১২ সালে উৎসবের তারিখ ছিল জানুয়ারি ২৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২। ২০১৩ ও ১৪ সালের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১-১০। ২০১৫-তে সেটি হল জানুয়ারি ২৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ৫। আবার এবছর তা এগিয়ে আনা হয়েছে ডিসেম্বর ১৫ থেকে ২৪।

আক্ষেপের কথা শোনাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট নাগরিকরাও। কয়েক বছর আগেও এই উৎসবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন আলিপুরদুয়ার শহরের হোটেল ব্যবসায়ী সমীরণ পাল। আজ ডুয়ার্স উৎসব

প্রসঙ্গে শুধু আক্ষেপই শোনালেন। স্পষ্ট করেই জানালেন, শুরুর কয়েক বছর পরই ডুয়ার্স উৎসব তার মূল লক্ষ্য থেকে নব্বই ডিগ্রি সরে গিয়েছে। এমনকি তিনি ডুয়ার্স উৎসবকে উৎসব বলার চেয়ে মেলা বলতেই বেশি পছন্দ করেন। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে একটা উৎসব চারিত্রিকভাবে বদলে গেল জানতে চাওয়া মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, মূলত রাজনৈতিক কারণেই, এর বেশি বলা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, শুরুর কয়েক বছর পর্যটনের প্রচার ও প্রসার গুরুত্ব পেয়েছিল, কিন্তু তারপর বিনোদনই হয়ে উঠল প্রধান। প্রশ্ন ওঠে, সেসব না থাকলে কি উৎসব কখনও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে? মানুষ কি ভিড় জমাবে? সমীরণের পালটা প্রশ্ন, কলকাতার বক্স অফিস হিট কিংবা নামীদামি আর্টিস্ট এনে ভিড় বাড়ালে ফায়দা কার? ডুয়ার্সের মানুষের? তাঁর প্রশ্ন, ভিড় বেড়েছে ঠিকই, আকর্ষণও আগের চেয়ে বেড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু ডুয়ার্স উৎসব আলিপুরদুয়ার ছাড়িয়ে কত দূর পৌঁছেছে? পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়ন, সেটাই বা কত দূর প্রসারিত হয়েছে? একসময় ডুয়ার্স উৎসবের কমিটিতে থাকা সমীরণবাবু নিজে থেকেই সরে এসেছেন, উৎসাহ হারিয়ে। তাঁর মতে, হোটেল ব্যবসায়ী তিনি, স্বভাবতই তাঁর কাছে ডুয়ার্সের পর্যটন উন্নয়নই আসল লক্ষ্য। সেটাই যদি না ঘটে থাকে, তাহলে তিনিই বা কেন সেখানে তাঁর শ্রম আর সময় নিয়োগ করবেন?

কিন্তু উৎসবের মান বা আকর্ষণ কমছে মানতে নারাজ অনেকেই। ডুয়ার্স উৎসব যে কেবল আগের থেকে অনেক অনেক বেশি আকর্ষণীয়ই হয়নি, পর্যটন প্রসারেও তার লক্ষ্যমাত্রাকে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে এমন বিশ্বাস রাখেন আলিপুরদুয়ার পৌরসভার পুরপতি আশিস দত্ত। তাঁর মতে, ডুয়ার্স উৎসব সাড়া ফেলেছে প্রধানত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কারণে। বিশেষ করে আদিবাসী লোকশিল্প সম্ভার, সংস্কৃতি—তাদের নাচ-গান এখানে যে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়, তার টানে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসাম, ভুটান থেকে মানুষ আসে, এমনকি কলকাতা থেকেও। এই উৎসবে ডুয়ার্স পর্যটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার প্রচার-প্রসার তো আছেই, উন্নয়নের কথা ভেবে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয় তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলিপুরদুয়ার শহরে ডুয়ার্স উৎসব হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তাঁর মনেও শুরুতে ছিল, কিন্তু তারপর বিগত বছরগুলিতে অন্য জেলার মানুষের সমাগম দেখে তিনিও বেশ অবাক হয়েছেন।

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়কে ডুয়ার্স উৎসব প্রসঙ্গ জানানো মাত্রই তিনি হেসে বললেন, ওই উৎসবে তিনি ব্রাত্য। কারণ, বর্তমান শাসকদল বা তাদের অনুগামীরা বিরোধী দল বা তাদের কাউকেই কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোকে রীতি বলে বিশ্বাস করে না। জোট থাকাকালীন উৎসবে যদিও দেবপ্রসাদ রায় উৎসব কমিটিতে ছিলেন, কিন্তু জোট ভাঙতেই তিনি কমিটি থেকে তো বটেই, সৌজন্যমূলক আমন্ত্রণও পান না। তাঁর মতে ডুয়ার্স উৎসব মূলতই বিনোদনমূলক। আর সে কারণেই কলকাতা থেকে নাচ-গান ইত্যাদির শিল্পীদের অনেক টাকার বিনিময়ে উৎসবে আনা হয়। তাঁদের পাশে আঞ্চলিক কোনও প্রতিভাবান শিল্পীরাই হালে পানি পায় না। অন্যদিকে, তাঁদের না আনতে পারলে উৎসবও জমে উঠবে না। অতএব আদিবাসী, জনজাতি, লোকশিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি কথাগুলি অর্থহীন। পর্যটনের প্রচার, প্রসার কিংবা উন্নয়ন— সরকার বা তার পর্যটন দপ্তরের প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া অবাস্তব ভাবনা। আসলে ডুয়ার্স উৎসব ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পরিচালিত একটি বিনোদনমূলক উৎসব। সেখানে ডুয়ার্সের মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলি মুখোশের মতো সামনে রাখা হয়। পর্যটন তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়ে উৎসব পরিচালনার উদ্দেশ্য কী তা মনে হয় ডুয়ার্সবাসী কিংবা আলিপুরদুয়ারবাসীর আজ আর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

উৎসবের অধুনা কমিটি তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন মনে না করলেও ডুয়ার্সের পর্যটন উন্নয়ন বা আদিবাসী-জনজাতিদের নাচ-গান বা শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর জন্য কোনও উৎসবের দরকার নেই বলেই মনে করেন সচেতন সুনাগরিক অর্ণব সেন। তাঁর ব্যাখ্যা, সরকারি দপ্তরগুলির অধীনে এই বিষয়গুলি তাদের নিজস্ব গুণ ও মানে ইতিমধ্যেই অতি পরিচিত ও প্রসারিত। আর যদি সত্যিই সেগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে হয়, তবে তা সরকার ছাড়া বা সরকারি পরিচালনা ও সক্রিয়তা ছাড়া সম্ভবও নয়। ডুয়ার্সের পর্যটন, ডুয়ার্সের নিজস্ব সংস্কৃতি গুণ ও মানে এতটাই উজ্জ্বল যে, তাকে সামনে রেখে যে কোনও উৎসবই অন্য মাত্রা পেতে পারে। অর্ণব সেনের কথায়, উৎসবে এখানকার জনজাতির জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটবে এমনটা ভাবা অন্যায়, সে কাজ সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের। আসলে ডুয়ার্স উৎসব শাসকদল পরিচালিত কয়েক দিনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। কলকাতার দামি গাইয়ে-বাজিয়ে নাচিয়েদের এনে আলিপুরদুয়ারের শীতের বাতাস উষ্ণ করে তোলার একটা চেষ্টা। সেই চেষ্টায় স্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিস্বার্থের প্রভাব খাটে। আঞ্চলিক উদীয়মান শিল্পী, কারিগর, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাও নেতাদের সৌজন্যে সামান্য উপকৃত হয়। কলকাতার বিদ্বজ্জনরাও ডুয়ার্স ভ্রমণ করেন। আর আসর জমিয়ে দেওয়া শিল্পীরা বেশ খানিকটা সাম্মানিক আদায় করেন, তাঁদের কিঞ্চিৎ সংস্থান ঘটে, সেটুকু বলা যায়।

> ডুয়ার্স উৎসবে রাজনৈতিক খবরদারি বৃদ্ধির অভিযোগ তোলেন আজকাল অনেকেই। কিন্তু একটু গভীরে ভাবলেই দেখা যায় এই রাজনীতিকরণের ভাঙা বেড়া তৈরি হয়েছিল সূচনাতেই।

মধ্যে অন্যতম। পাশাপাশি আদিবাসী-জনজাতি, তাদের নাচ-গান, শিল্পসামগ্রী। যদি সেসব কিছুর যথার্থ প্রচার বা প্রসারের সদিচ্ছা নিয়ে উৎসব করতে হয়, তবে সরকারকে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলিকে তো বটেই। যদিও এ কথা ঠিক, বাণিজ্য আর সংস্কৃতি একইভাবে সফল করে তোলা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তবুও মানা যায়, যদি তার পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টায় সেই ইচ্ছে লক্ষ করা যায়। যদি দেখা যেত, অন্তত আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন উন্নয়নে সরকার কোনও রোড শো করেছে বা ওই ধরনের কোনও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছে। কিন্তু ডুয়ার্সের পর্যটনের উন্নয়নে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ডুয়ার্সের পর্যটন আজ যতটুকু তা তার নিজস্ব মহিমায়।

ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীদের স্বীকারোক্তি, টিভি চ্যানেলের ভ্রমণ বিষয়ক কয়েকটি অনুষ্ঠান মানুষের সামনে অচেনা-অজানা ডুয়ার্সকে যতটুকু সম্ভব তুলে এনেছে। অথচ গত এগারো বছরে পর্যটন বিকাশে এই ভূমিকা পালন করার কথা ছিল ডুয়ার্স উৎসবের। তাঁদের মতে, দলের স্থানীয় নেতাদের হাতে

ডুয়ার্স উৎসবের সূচনাকালে সমগ্র ডুয়ার্স না হলেও অন্তত আলিপুরদুয়ারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ লক্ষ করা গিয়েছিল, কারণ শুরুতে রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের শহর আলিপুরদুয়ারের উন্নয়ন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের আর দেখা গেল না। কারণ, সেখানেও যথারীতি রাজনৈতিক ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটল। এটা ঘটনা, ক্ষমতাসীন

উৎসবের উদ্দেশ্য সফল করতে চাই সক্রিয় সরকারি অংশগ্রহণ।

রাজনৈতিক দল ক্রমেই উৎসবের পরিকল্পনা থেকে পরিচালনার দখল নিয়ে ফেলেছে। তবে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক বা অবাস্তব নয়। কারণ একটু গভীরে ভাবলেই দেখা যায়, নাগরিক উৎসবে এই রাজনীতিকরণের বীজ কিন্তু পোঁতা হয়েছিল বহু আগেই, সাধারণ মানুষের অলক্ষ্যে। ২০০৫ সালে আলিপুরদুয়ারের তৎকালীন মহকুমাশাসক ডঃ সৌমিত্রমোহন প্রথম ভেবেছিলেন এই উৎসবের কথা। তাঁর ব্লগ পড়লে জানা যায়, ডুয়ার্সের অনুন্নত জনজাতি ও পর্যটনকে বাইরের দুনিয়ায় তুলে ধরার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত এই উৎসবে একটি ফাঁক কিন্তু সবার অলক্ষ্যে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেটি হল, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সচেতন নাগরিকদের সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগ। গোড়ায় নাগরিক সমাবেশ ঘটলেও পরবর্তীকালে অতি সন্তর্পণে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটানোর ভাঙা বেড়া তখনই তৈরি করা হয়েছিল, সেটি কার বা কাদের অঙ্গুলিহেলনে তা অবশ্য সৌমিত্রমোহনের ব্লগ থেকে জানা যায় না। তবে এটুকু সবারই জানা সে সময় এ রাজ্যে বাম শাসনের প্রবল প্রতাপে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলত এগারো বছরে এইরকম উদ্যোগের পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হয়েছে।

অতএব কেবল রাজনীতিকরণকে দোষী ঠাউরে গালিমন্দ না করে আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠুক একটু অন্যরকমের। উৎসবের আসল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি হয় ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্পের প্রসার আর তার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, তবে সরকারি পর্যটন দপ্তর সেই উৎসবের দায়িত্ব গ্রহণ করে না কেন? তাহলে কীভাবে সম্ভব পর্যটন বা সেই শিল্পের উন্নয়ন? এত বড় একটা শিল্প, তার প্রসার বা পরিকাঠামোগত কোনও কাজ কি একটা উৎসব কমিটির পক্ষে করা কোনওভাবে সম্ভব? কমিটির সদস্য কিংবা পদাধিকারীরা হতে পারেন স্থানীয় নেতা, কিন্তু পর্যটন বা ওই শিল্প সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কত দূর? একই প্রশ্ন খাটে আদিবাসী বা জনজাতি মানুষদের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজে, আলিপুরদুয়ার জেলাসহ পাশাপাশি জেলার লোকশিল্পী ও অন্যান্য মহলে এই উৎসবের নির্যাস কি আদৌ লাভজনক প্রভাব ফেলতে পেরেছে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

জনজাতির ডুয়ার্স

নাগেশিয়াদের কথা

নাগ বা সর্প থেকে এদের নামের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। এদের তিনটি উপবিভাগ রয়েছে— তেলহা, সিন্দুরি এবং ধুরিয়া। এরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে সাদরি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে। লেখার ক্ষেত্রে এরা দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করে।

নাগেশিয়ারা সাধারণত খর্বকায়, লম্বাটে মাথা, চওড়া ও চ্যাপটা নাসিকাবিশিষ্ট। এরা সাধারণত নিরামিষাশী। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, গম, জোয়ার, বজরা। মদ্যপান করে। ডুয়ার্স অঞ্চলে এদের বসবাসের শুরু চা-বাগান পত্তনের যুগ থেকে। আগে কৃষিজীবী ছিল। এখন ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক। এরা সূর্যদেবের উপাসনা করে। পূর্বপুরুষের আত্মাকে পূজা করে।

নাগেশিয়া ছেলেদের পনেরো থেকে আঠারো বছর এবং মেয়েদের আট থেকে তেরো বছরেই বিয়ে দেওয়ার প্রথা ছিল। এক এবং বহুবিবাহ সমাজসিদ্ধ। বিয়ে সাধারণত সম্বন্ধ করে ঠিক হয়। সিঁদুর গ্রহণকে বিয়ের প্রতীক বলে মেনে নেওয়া হয়। ধান, চাল, তেল, ডাল ইত্যাদি কন্যাপণ হিসেবে দেওয়ার রীতি। বিয়ের পর নবদম্পতি ছেলের বাবার বাড়িতেই থাকে। বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত। তবে সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান হয় কনের বাড়িতে। বিয়ের ঘটককে বলে 'আগুয়া'। আগুয়ার মাধ্যমে কথাবার্তা ঠিক হলে বরের বাড়ির পক্ষ থেকে কনের বাড়িতে পাঠানো হয়— একটি নতুন শাড়ি, ব্লাউজ, কানের দুল, আয়না, চিরুনি, নকল খোঁপা বা চুলের গাছি। সেখানে পাত্রপক্ষের সামনে মেয়েকে ওই পোশাকে সাজিয়ে পাঁচজনের সামনে হাজির করানো হয় এবং সূত্র বন্ধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পর মেয়ে বাগ্‌দত্তা বলে গণ্য হয় এবং কন্যাপক্ষ অপর কোনও যুবকের সঙ্গে ওই কন্যার বিয়ের কথাবার্তা বলতে পারে না। এর পর মেয়ের বাড়ি থেকে দশ-বারোজন লোক ছেলের বাড়ি গিয়ে 'ঘরবাড়ি' দেখে আসে। ঘরবাড়ি হল ঘরে তৈরি ডালের বড়ি। সেই সঙ্গে হাড়িয়া পানও চলে। ছেলের পক্ষ থেকেও মেয়ের বাড়ি গিয়ে ঘরবাড়ি অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি হয়।

নাগেশিয়াদের মধ্যে মেয়েকে বরের বাড়ি তুলে এনে বিবাহ দেওয়া হয়। পান-লগনের দিন ছেলে পক্ষের লোকেরা এসে বাজনা সহকারে মেয়েকে তুলে আনে। কনেকে আনার পর প্রথমে তাকে বরণ করা হয়।

কনের সিঁথিতে সরষের তেল ঢেলে তাতে একটি তিরের ফলা চোবানো হয়। নাগেশিয়া বিবাহে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— মুন্ডা সমাজের কোনও গোষ্ঠীর মতো এরা সিঁদুর ব্যবহার করে না। সরষের তেল ব্যবহারকেই মাঙ্গলিক বলে মনে করা হয়। পরদিন 'চুমওন'। সাধ্যমতো সবাই বর-কনেকে উপহার দেয়। উপহার শেষে সামাজিক ভোজের মধ্য দিয়ে বিয়ে শেষ হয়। প্রথা অনুযায়ী 'নই' বা 'ঠাকুর' সম্প্রদায়ের কোনও সদস্য বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

নাগেশিয়াদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীসত্তা থাকে, যা সাধারণত নাগেশিয়া সমাজ নামে পরিচিত। নাগেশিয়ারা হিন্দু প্রথামতো 'নব', 'ফাগুন', 'দিওয়ালি' এবং 'মাঘ পরব' পালন করে। গ্রামের প্রধান দেবদেবী হিসেবে মহাদেব এবং আহোরিয়া মাতার পূজা করে। পুজো-আর্চা চলাকালীন নাচ-গানের প্রচলন আছে। নাগেশিয়াদের একটি বড় অংশ রাজমোহিনী দেবী, সাহানী গুরা এবং গাহিরা গুরুর সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে— যদিও এদের কিছু অংশ খ্রিস্টধর্ম অনুসারী।

মৃতদেহ দাহ এবং কবর দেওয়া উভয় পদ্ধতিই প্রচলিত নাগেশিয়া সম্প্রদায়ে। পরিবারের কারও মৃত্যু হলে দশ দিন অশৌচ পালন করা হয়ে থাকে। দশ দিন পর শ্রাদ্ধকর্ম হয়। শ্রাদ্ধের দিন মৃতের আত্মীয়রা চুল ও নখ কেটে ফেলে। নাগেশিয়া অন্ত্যেষ্টিতে মৃতদেহ তেল-হলুদ মাখিয়ে নতুন কাপড়ে ঢেকে কবর বা দাহস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। কবরে নিয়ে যাবার আগে কৌমের লোকেরা পাঁচবার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করে। ওঝা এসে মৃত ব্যক্তির ঘরের সামনে একটি মুরগির ডিম ফুটো করে তাতে পালক বসিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম ধরে আহ্বান করে। পালক কেঁপে উঠলে বিশ্বাস করা হয়, আত্মা উপস্থিত। কলাপাতার দোনা দিয়ে ওই ডিম ঢেকে দেওয়া হয়। এটাই শ্রাদ্ধশান্তি 'ছাই ভিতরয়েক'। রাতে হয় সামাজিক পান-আহার।

প্রমোদ নাথ

পার্পল টি ডুয়ার্সের চা-শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে

দক্ষিণ ভারতের, এমনকি উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলিকে এই আলোচনায় না রাখা যেতেই পারে। তবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য সরকারগুলি সেখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা-বাগিচা নিয়ে কত গভীরভাবে চিন্তা করে, সে বিষয়টি উল্লেখ না করে উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে নীলাভ লাল চা, যা বাজারে 'purple tea' বলে পরিচিত, তার সাফল্যের কথা বলাটাও খুব জরুরি। তা না হলে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাইয়ের ক্ষুদ্র চা-বাগানে নিযুক্ত অসংখ্য ভাগ্যান্বেষীর কাছে অপরাধী থাকতে হয়।

চা বলতে সাধারণত চা-পিপাসীরা বোঝেন গ্রিন অর্থোডক্স এবং সিটিসি চা। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার, চা কিন্তু প্রকৃত অর্থেই বনৌষধি। বিভিন্ন গবেষণায় চায়ের ওষধি গুণের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাকে 'চা-হার্বাল' বলে উত্তরবঙ্গের চা বিশেষজ্ঞ রাম অবতার শর্মা সঠিকভাবেই জানিয়েছেন। চা-গাছের পাতায় অন্য কোনও কিছু না মিশিয়ে উইপারিং, রোলিং, অসিডাইসেন এবং ড্রাই-এর যথাযথ পদ্ধতি মেনে যে চা উৎপাদন করা হয়, সেখানে পাওয়া যায় নানা ওষুধের গুণ। একে সামনে রেখেই বাজারে এসে জমা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের অপরীক্ষিত লতা ও শেকড় নির্যাস মিশ্রিত ভেজাল টি হার্বাল। অথচ সরকার উদ্যোগী হলেই এই অঞ্চলের বিশাল সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করে গড়ে তোলা যেত ওষুধ শিল্প। তাহলে আনারসবাগানের উদ্যোগপতিদের মতো ক্ষুদ্র চা-বাগিচার মালিক এমনকি বৃহৎ চা-বাগিচার মালিকদেরও অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক চা-বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হত না। বরং তাঁরা চা-পাতার একটা বিশাল বিকল্প বাজার খুঁজে পেতেন। চায়ের ওষধি গুণ পৃথক এক অধ্যায়ে আলোচনার দাবি রাখে। এখানে 'পার্পল টি'-র বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হল।

হালকা লালচে নীল বা পার্পল টি

পার্পল টি নিয়ে আলোচনা করার আগে চা-পান নিয়ে দু'-একটা কথা বলে নিতে হয়। পৃথিবীতে চা-পান করে না এমন মানুষ এখন

কেনিয়ায় পার্পল টি বাগানে চা-শ্রমিক

খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক সিডনি স্মিথ বলতেন– 'Thanks God for tea. What would the world be like without tea? How did I exist? I am glad I was not born before tea.'

আজ যে এত সহজে এবং এত দ্রুত চা সবার কাছে এমন প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার জন্য চা-প্রেমিকরা আসামের আমগুড়ি চা-বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার উলিয়াম ম্যাকারচারের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কারণ, তিনি যে মেশিনটা তৈরি করেছিলেন, সেই মেশিন থেকে উৎপন্ন লাল দানাদার, যে চা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়, তাকে বলে CTC চা। ১৯৩০ সালে এই মেশিনটি তিনি আবিষ্কার করেন। এর সম্পূর্ণ কথাটি হচ্ছে Crushing Tearing and Curling। ওই মেশিনটি আবিষ্কৃত হওয়ায় সারা পৃথিবী জুড়েই চা অতি সহজে পানীয় রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে আর চা-পানের পরিমাণ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরই জন্য উলিয়াম ম্যাকারচার ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'নাইটহুড' উপাধির অধিকারী হয়েছিলেন।

তার আগে দু'ধরনের চা তৈরি করা হত— গ্রিন ও অর্থোডক্স। চিন রপ্তানির উদ্দেশে মূলত গ্রিন অর্থোডক্স চা তৈরি করে। শ্রীলঙ্কাও প্রধানত অর্থোডক্স চা তৈরি করে, আফ্রিকার দেশগুলি তৈরি করে সিটিসি। ভারতের চা-বাগানগুলিতে তিন ধরনের চা তৈরি হয়। বিশ্ববিখ্যাত দার্জিলিং চা মূলত অর্থোডক্স চা। বিদেশের মানুষরা স্বাস্থ্যসচেতন। তারা দার্জিলিং চায়ের ঘ্রাণের জন্য যতই আকৃষ্ট হোক না কেন, তাদের প্রধান শর্ত থাকে চা-গাছ এবং উৎপাদনে কোনও রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার চলবে না। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য চা উৎপাদনে দার্জিলিং চা-বাগিচা মালিকরা তাই ব্যবহার করে থাকেন জৈবিক উপাদান। এর ফলে চা উৎপাদনের ব্যয় যে অনেকটা বেশি হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বিদেশের বাজারে বিশাল মূল্যে সেই চা বিক্রয় হয়। ১ কেজি দার্জিলিং চা সেখানকার বাজারে ৬,০০০ টাকা থেকে ৩৫,০০০ টাকা দরে পর্যন্ত বিক্রি হয়।

সারা বিশ্ব জুড়ে চায়ের এই বাজার থাকলেও এখানে আছে তীব্র প্রতিযোগিতা ও বাজারদরের ওঠানামার অনিশ্চয়তা। যেমন বর্তমানে চা বিশ্ববাজারে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। চা-বাগান সূত্রে বলা হচ্ছে, বিগত তিন বছরের মধ্যে চা-শিল্পে এমন সংকট দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে, সারা দেশ জুড়ে প্রায় এক কোটি মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আছে। একই সংখ্যক মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র অপ্রত্যক্ষভাবে চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখন তো চা-বাগিচা বলতে আর বৃহৎ চা-শিল্পপতিকেই বোঝায় না। ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি হিসেব থেকে দেখা যায়, দেশে যে ১,৫৯,১৯০টি চা-বাগিচা ছিল, তার মধ্যে ক্ষুদ্র

বড় গাছ উপড়ে পড়লে তার ছায়ায় আশ্রিতরা যেমন চাপা পড়ে তেমনই চা-বাণিজ্যে সংকট এলে যদি বৃহৎ চা-বাগিচা শিল্প টালমাটাল হয়, ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলিও সমূলে উৎপাটিত হতে পারে।

চা-বাগিচার সংখ্যা ছিল ১,৫৭,৫০৪টি। এর মধ্যে আরও ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যা দ্রুত হারে যোগ হয়ে চলেছে। বৃহৎ বা ট্র্যাডিশনাল চা-বাগিচার সংখ্যা কিন্তু বলতে গেলে একই আছে। বড় গাছ উপড়ে পড়লে তার ছায়ায় আশ্রিতরা যেমন চাপা পড়ে তাদের অস্তিত্ব হারায়, তেমনই চা-বাণিজ্যে সংকট এলে তার ঝাপটায় যদি বৃহৎ চা-বাগিচা শিল্প টালমাটাল হয়, তবে তো ক্ষুদ্র চা-বাগানগুলিও সমূলে উৎপাটিত হতে পারে।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে। একসময় হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা ও কলকাতার পরিচয় ছিল চট শিল্পের রাজধানী বলে। আজকের চট শিল্পের যে নাভিশ্বাস তা তো একদিনে ঘটেনি। এই শিল্পের ক্ষয়রোগের চিহ্নগুলি তো রাতারাতি উপস্থিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই জানান দিতে শুরু করেছিল। সুচিকিৎসকের যেমন দায়িত্ব অসুখের চিহ্নগুলি বোঝা, অসুখের শেকড় আরও দ্রুত যাতে ছড়িয়ে চিকিৎসার ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়, তার প্রতিরোধী চিকিৎসা করা, তেমনই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল চটকল শিল্পের ওই অসুখের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আজ সেই একই প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে এবং বলা যেতে পারে, চা-শিল্পের ক্ষেত্রে ভাবনাটা আরও গভীর। চটকলে যারা শ্রমিক, তাদের শ্রেণিগত চরিত্র চা-শ্রমিকদের থেকে ভিন্ন। চটকলের উপর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সেখানকার সিংহভাগ শ্রমিকই এসেছে ভিন প্রদেশ থেকে। অথচ ওই চট শিল্প পত্তনের সময় বাঙালি শ্রমিকেরই আধিক্য ছিল। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, স্থানীয় জমিহারা মানুষরা এখানে কাজের জন্য ভিড় করেছিল। অন্যদিকে চা-শিল্পে স্থানীয় শ্রমিকদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ক্ষুদ্র চা চাষ ছাড়া সংগঠিত চা-বাগিচায় এখনও স্থানীয় কোনও চা শ্রমিক নেই। এরা এসেছিল আদিবাসী অধ্যুষিত ঝুম বা Shifting Cultivation বা খাদ্য শিকার ও সংগ্রহকারী চরিত্রকে বহন করে। ফলে জীবিকা হিসেবে এই সমস্ত আদিবাসী চা-শ্রমিকের কাছে চা-বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোনও উপায় জানা নেই।

চট শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ২৪ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ, ৩৩ শতাংশ বিহার, ২৩ শতাংশ উত্তরপ্রদেশ, ১০ শতাংশ ওড়িশা, ৪ শতাংশ মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ, বাকি ৩.৩ শতাংশ অন্যান্য প্রদেশের। এদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল ছোট কৃষক পরিবার থেকে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি মরশুমে দেশের বাড়িতে চাষের কাজে চলে যায়। ফলে এখানে ভাউচার শ্রমিক প্রথা চালু হয়েছিল। এদের বেতনের তালিকায় নাম থাকে না। ভাউচারে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। আলোচ্য প্রতিবেদনটি চা-বাগানের অবস্থা নিয়ে। তাই চটকলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে পশ্চিমবাংলার দুই প্রধান শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থায় এখানকার শ্রমিকদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার একটু দরকার আছে।

চটকল মূলত যন্ত্রনির্ভর শিল্প। বাজারের চাহিদা মেটাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেত। অবশ্য এর ফলে শ্রমিক সংকোচনও হত। চা-বাগিচা শিল্প পুরোপুরি শ্রমিকনির্ভর শিল্প। এখানে উৎপাদন বাড়াতে হলে যন্ত্রের সাহায্যে তা করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার চা-গাছের 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' চয়ন করার অভিজ্ঞ আঙুলের ছোঁয়া। সেই কাজে চাই দক্ষ মহিলা চা-শ্রমিক। চট শিল্পে সেলাই বিভাগ ইত্যাদিতে মহিলা শ্রমিকদের প্রাধান্য এতটাই ছিল যে, স্থানীয় ভাষায় সেলাই বিভাগকে বলা হত 'মাগি' কল। ৭০ দশক পর্যন্ত চটকলে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। বর্তমানে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে এক হাজারেরও কম। চা-বাগিচার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এখানে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের অনুপাত প্রায় সমান। ফলে চা-বাগিচা শিল্পে মহিলা শ্রমিকরা চা-বাগিচার কাজ ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে কাজ করতে অভ্যস্ত হয় না। চায়ের কাজ থেকে উচ্ছেদ হলে এরা কিন্তু সাধারণ কৃষি পরিবারের সদস্যদের মতো কৃষিতে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে না। ফিরে যেতে চায় তাদের পূর্বপুরুষদের রক্তে প্রবাহিত ঝুম বা স্থানান্তরিত কৃষিকাজে। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবাংলা ও আসামের সীমান্ত এলাকার বনভূমিতে কর্মচ্যুত সাঁওতাল শ্রমিক ও বোড়োদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে গেল, তার পেছনের কারণ বুঝতে হলে আদিবাসী এই শ্রমিকদের মানসিকতার প্রতি নজর দিতেই হবে।

বোড়ো ও সাঁওতাল উভয়ই আদিবাসীভুক্ত জনজাতি। বনবাসী বোড়োরা তাদের ঐতিহ্যগত দিক থেকেই স্থানান্তরিত চাষি। স্থানান্তরিত চাষের জন্য দরকার বড় এলাকা। কারণ, এক জায়গায় চাষের পর ঝুম চাষিরা সেই জায়গার উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে অন্য এলাকায় চাষ শুরু করে। ফের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই পুরানো জায়গায় ফিরে আসে। চা-বাগানের কর্মহীন ও ভূমিহীন সাঁওতালরা বোড়ো অধ্যুষিত বনভূমিতে বাঁচার তাগিদে একই ঝুম চাষ শুরু করলে তারই ফল সেদিনের সাঁওতাল ও বোড়োদের মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নকশালবাড়ির প্রসাদ জোতে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যে নয়জনের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ঘটনা নকশালবাড়ির কৃষি বিপ্লব বলে ঘোষিত। কিন্তু সেই শহিদরা কেউ প্রকৃত অর্থে কৃষক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন কর্মচ্যুত চা-শ্রমিক পরিবারের সদস্য। সবাই আদিবাসী। বাঁচার তাগিদে চা-বাগানের পরিত্যক্ত জমিতে সাবেকি প্রথায় চাষ করে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। অপরদিকে উত্তরবাংলায় যারা প্রকৃত অর্থে কৃষক, সেই রাজবংশী সম্প্রদায় সেই ঘোষিত কৃষক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল। তার প্রমাণ, রাজবংশী জোতদার সম্পদ রায় নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি শহরে মিছিল সংগঠিত করেছিল। শিলিগুড়ির ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ কৃষক সমাবেশ বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা যা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। চা-শিল্প ছাড়া একমাত্র অবলম্বন কৃষি হওয়া সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের কৃষকসমাজ পরবর্তীকালে ভারত জুড়ে কৃষি বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ বলে পরিচিত হলেও কেন এই বিপ্লবের শরিক হল না, সে প্রসঙ্গ ভিন্ন ও বিস্তারিত আলোচনার, যা এই পরিসরে সম্ভব নয়।

চা-শিল্পের বিকল্প পথগুলি খোঁজা দরকার

আধুনিক বিশ্বের নতুন প্রযুক্তির মোকাবিলায় পাট শিল্পের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজার ক্ষেত্রে সরকার ও পাট মালিকের যৌথভাবে গবেষণার প্রয়োজন ছিল। সেই ব্যর্থতার জন্য আজ পাট শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থা। ফলে শুধু যে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মহীন হতে হয়েছে তা নয়, একসময় দেশে মুদ্রা অর্জনের প্রধান শিল্পের অবস্থার জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় এসে পড়েছিল প্রচণ্ড আঘাত। সেই আঘাত পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর কারণ, সারা দেশে মোট ৯৩টি চটকলের মধ্যে ৫৯টিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

পাট শিল্পের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতায় এ রাজ্যের বর্তমানে প্রধান বিদেশি মুদ্রা অর্জনের

ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ধূপগুড়ি পৌরসভা

ধূপগুড়ি ডুয়ার্স ভূখণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। ধূপগুড়ির শরীর ও মনে ডুয়ার্সের ইতিহাস-ভূগোল ও সংস্কৃতির প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই রয়েছে সমান ভাবে। তা সত্ত্বেও ধূপগুড়ি তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। পরিতাপের বিষয় দীর্ঘকাল অনুন্নয়ন ও পুর পরিষেবার অবহেলায় ধূপগুড়ি পুর এলাকার মানুষ পদে পদে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এক দিকে অনুন্নয়ন অন্য দিকে সংস্কার না হওয়ার ফলে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ধূপগুড়ি পুর এলাকার আনাচকানাচ। উন্নয়ন মূলক কোনও প্রকল্প না থাকায় এলাকার কোনও উন্নতিসাধনই ঘটেনি। সংস্কার হয়নি পথঘাট, নিকাশী, জলাধার থেকে শুরু করে পানীয় জল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার। এক কথায় পৌরসভার এলাকার উন্নয়নে, সৌন্দর্যায়নে এমনকি পুরবাসীদের ন্যূনতম পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রাজ্য রাজনীতির পট বদলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসার পর রদবদল ঘটে ধূপগুড়ি পৌরসভাতেও। নতুন পৌরসভা গঠনের পর উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও তা কার্যকর করার সক্রিয় সদিচ্ছা লক্ষ করা যায়। মাত্র কয়েক বছরে পৌরসভা এলাকাবাসীকে পুর পরিষেবা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত এলাকার পথঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, খাল-বিল-পুকুরসহ জলাশয়গুলির সংস্কার, নতুন করে বাঁধ নির্মাণ, পাকা রাস্তা, ড্রেন ও সেতু তৈরি সহ বহু কাজে উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখে। এখন ওই পুর এলাকায় একজন বহিরাগত এসে চোখ রাখলেও বুঝতে পারেন উন্নয়ন আর সংস্কারে কতটা বদলে গিয়েছে ধূপগুড়ি।

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ্য, কুমলাই ও বামনি নদীর উপর আটটি ব্রিজ, থানা রোডকে ওয়ান ওয়ে করা, রাস্তা চওড়া করা, ১০টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কুমলাই ড্যাম মেরামত, শ্মশানঘাট মেরামত, নতুন পৌরসভা ভবন নির্মাণ, এরকম আরও অনেক। আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, মায়ের থান থেকে সুকান্ত কলেজ পর্যন্ত উন্নত রাস্তা, বাস টার্মিনাস ইত্যাদি।

উৎসবের কাল প্রায় অতিক্রান্ত। কয়েক দিন পরেই নতুন বছর। আরও এক শুভারম্ভের প্রাক্কালে আমরা পুর এলাকার সমস্ত নাগরিকবৃন্দের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করি। সেই সঙ্গে আরও একবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য।

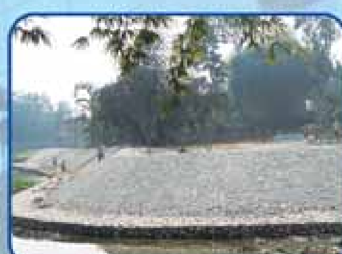

অরূপ দে
ভাইস চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

শৈলেন চন্দ্র রায়
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

ফসল চা-শিল্পের বিকল্প ব্যবস্থাগুলি নিয়ে যে ভাবনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত, ছিল তার কোনও পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

আগেই বলা হয়েছে, চা এখন আর নিছক ক্লান্তিনাশক পানীয় নয়, এর ভেষজ গুণ নিয়েও চলেছে ব্যাপক গবেষণা। কেনিয়া 'পার্পল টি' চাষে ব্যাপক সাফল্য ও বিশ্ব জুড়ে যে বাজার পেয়েছে, তার কারণ এই নীলাভ সোনালি চা। শুধু সে চায়ের ঘ্রাণ ও স্বাদ নয়, ওই চা তার ভেষজ গুণের জন্যও পরীক্ষিত। এই চা উৎপাদনে পৃথিবীতে কেনিয়ার পরেই ভারতের আসামের স্থান। মনে রাখা দরকার, ভারতে প্রথম চা-চাষ শুরু হয়েছিল আসামে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল দার্জিলিং পাহাড়সহ ডুয়ার্স ও তরাই এলাকায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জলবায়ু ও মাটির চরিত্র আসামে চা-চাষের সাফল্য এনে দিয়েছিল তা একই রকমভাবে তরাই ও ডুয়ার্সের চা-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। তাই আসামে যদি পার্পল টি চাষ সাফল্য এনে দিতে পারে, উত্তরবঙ্গেও যে ঘটবে, তাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই।

'Camellia assamica' শ্রেণির চায়ের ওষধি গুণের জন্য ইতিমধ্যে অনেক চা বিশেষজ্ঞই 'ভবিষ্যতের চা' বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এই চা-গাছের পাতায় আছে অ্যানথোসায়ানিনস (anthocyanins) নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ (pigment) যার ফলে এই চায়ের রং হয় নীলাভ লাল। এর মধ্যে সাধারণ চায়ের সব স্বাদ-গন্ধ থাকার ফলে শুধু রং ছাড়া চা-পানের কোনও পার্থক্য চা-প্রিয় মানুষ টের পায় না। অথচ এই চায়ে আছে তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায় ক্যাফিন। এই চা কালো এবং সবুজ চায়ের মতোই প্রস্তুত করা যায়।

চা-বিশেষজ্ঞরা তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন এই চায়ে আছে বেদনানাশক গুণসহ ক্যানসার প্রতিরোধী এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের গুণ। এই চা-পানে শরীর পায় বহুমূত্র রোগ এবং শরীরে মেদ বৃদ্ধির প্রতিরোধী উপাদান। অ্যানথোসায়ানিনস কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও এই চা-গাছের পাতা থেকে নানা উপজাত পাওয়া যায়। যেগুলি নানা ওষুধ এবং খাদ্য সংরক্ষণ ছাড়াও নানা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়, যেমন catechins, anthocyanins, anthocyanidinins। কেনিয়া এবং উগান্ডার চা-গবেষণাকেন্দ্রের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এর হলুদ উপাদান মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ প্রতিবন্ধকতার প্রতিষেধক রূপে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই চায়ের আরও একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সাধারণ চায়ের ঘ্রাণের তুলনায় এর ঘ্রাণ যেমন তীব্র, তেমনি মনমাতানো। অর্থাৎ দার্জিলিং চা যেভাবে তার ঘ্রাণের জন্য চা-প্রেমিকের মন জয় করে নিতে পেরেছে, পার্পল টি-ও তার এই গুণের জন্য দার্জিলিং চায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে অন্য চায়ের মতোই এই চায়ের স্বাদ ও গন্ধ স্থানীয় পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

কেনিয়া পার্পল টি উৎপাদনে পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী হলেও এই চায়ের উৎসকেন্দ্র আসাম। ১৯০৩ সালে জি ডব্লিউ এল কেইন নামে এক ইংরেজ আসাম থেকে কয়েকটি 'পার্পল টি' ঝোপ এনে সেখানকার লিমরু পাহাড়ি জঙ্গলে রোপণ করেছিলেন। এই চা-গাছগুলিই সেখানে বিশাল চা-গাছের ঝোপে পরিণত হয়ে পার্পল টি বাগানে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি বর্তমানে ইউনিলির্গসের মালিকানায় Mabroukie T.E বলে পরিচিত।

১৯০৩ সালে কেনিয়ার মাটিতে এই চা রোপণ করা হলেও, সেখানকার চা-গবেষণাকেন্দ্র Tea Research Foundation of Kenya তাদের দীর্ঘ গবেষণায় TRKF 306 নামে এই চা-গাছের ক্লোনে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটায়। তারপর ২০১১ সালে মূলত রপ্তানিযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ওই চা-বাগিচা স্থাপন করা হয়। কেনিয়া সরকার ওই উদ্যোগকে সফল করতে সবরকমভাবে সাহায্য করে। ২০৩০ সালের আগাম বাজারকে লক্ষ্য রেখে তারা 'মিড টার্ম প্ল্যান ২০০৮-১২' কর্মসূচি গ্রহণ করে ওই ক্লোনকে আরও বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার জন্য গবেষণাকে অত্যাধুনিক করে তুলেছে। এই গবেষণায় তারা যে ৫১টি চা ক্লোন তৈরি করেছে, তার মধ্যে ৪১টি আসামের চা এবং ৬টি আসাম-চিন সংকর শ্রেণির চা-গাছ থেকে তৈরি। এর ফলে কেনিয়ায় যে শুধু চা উৎপাদনের পরিমাণ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, কৃষির অন্য ক্ষেত্রেও আনতে পেরেছে বিপুল সাফল্য। দেশের অর্থনীতিতেও যোগ হয়েছে উন্নতির স্রোত।

কেনিয়া যা পারে, ভারতেরও সেই ক্ষমতা আছে

কেনিয়া চা-শিল্প ও উৎপাদনে বিশ্ব চা-বাণিজ্য মানচিত্রে অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে ভারতের চা-বাণিজ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থিত হয়েছে। অথচ ভারতের চা-শিল্প কেনিয়ার থেকে শুধু যে অনেক প্রাচীন তা-ই নয়। সে তার দেশের উপযুক্ত পরিবেশকে ব্যবহার করে চিনকে পিছনে ফেলে দিয়ে বিশ্বের এক নম্বর চা রপ্তানিকারী দেশ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল— এই দীর্ঘ সময় সে তার এই স্থানটিকে দখল করে রেখেছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে চায়ের দ্রুত চাহিদা বৃদ্ধি ঘটেছে। সেটা লক্ষ করে অন্য দেশগুলি বাজার দখলের জন্য স্ব স্ব দেশের চা-শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের গুণমানও বৃদ্ধি করেছে। ভারতের চা-শিল্পের ক্ষেত্রেও যে আধুনিকতার প্রয়োগ আনা দরকার, সেদিকে কিন্তু কী মালিক, কী সরকার— কাউকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। ১৯৬৯ সালে চা রপ্তানির ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার মতো একটা ছোট দেশ ভারতের বিশাল চা-সাম্রাজ্যকে টপকে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছিল। তখনই কিন্তু ভারতের চা-দপ্তরের কর্তাদের চোখে বিপদের বার্তা ধরা পড়া উচিত ছিল। উচিত ছিল সতর্ক হওয়ার। বর্তমানে চা রপ্তানি বাণিজ্যে কেনিয়া সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়ে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে। ভারতের জায়গা এখন শ্রীলঙ্কার ও চিনের পরে চতুর্থ স্থানে। ইন্দোনেশিয়া তাদের দেশের চা রপ্তানিকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি করে চলে এসেছে একেবারে ভারতের কাছাকাছি। কেন এমন হল, পরে সেই আলোচনার ইচ্ছে রইল।

ভারতে কিন্তু চা নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। চায়ের বিশ্ব বাজার এবং এই শিল্পের বিরাট ভবিষ্যতের ছবিটি ইংরেজদের জহুরি দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। এটি যে একটি সংগঠিত শিল্প তা তারা বুঝতে পেরেছিল। তাই ১৮৭৮ সালেই গড়ে উঠেছিল Duars Planters Association। চা যে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামগ্রী, সেটাও তাদের কাছে অজানা ছিল না। তাই তারা ১৮৭৯ সালে লন্ডনে স্থাপন করেছিল Indian Tea Association। ১৮৮১ সালে গঠিত হল ITA Calcutta।

১৯০০ সালে ITA চা গবেষণার জন্য স্থাপন করে তাদের গবেষণা শাখা। Dr. H. H. Mann ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তা। সি বি আন্ত্রামের অধীনে ১৯০৪ সালে আসামের জোরহাটের Heelakh TE বাগিচা গবেষণা কেন্দ্র এবং কাছাড়ের Entomological Laboratory প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১১ সালে এই দু'টি কেন্দ্রকে বন্ধ করে জোরহাটের টোকলাইতে স্থাপন করা হল টোকলাই চা-গবেষণাকেন্দ্র, যার প্রথম মুখ্য অধিকর্তা ছিলেন Dr. G. D. Hope। যেটি ভারতের প্রধান চা-গবেষণাকেন্দ্র রূপে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে। ভারত সরকারের টি-বোর্ড এখানে চা নিয়ে গবেষণার জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। এ ছাড়া সংগঠিত চা-বাগানগুলি প্রায় সবাই বার্ষিক চাঁদার বিনিময়ে এই TRA-এর সদস্যপদ নিয়ে থাকে। আজ Toklai Experiment Stn. বিশ্বের প্রাচীনতম চা-গবেষণাকেন্দ্র।

টোকলাই চা-গবেষণাকেন্দ্রটি আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে যে সমস্ত গবেষণার বিভাগ আছে, সেগুলি হল— ১) Agronomy ২) Soil & Meteorology ৩) Botany ৪) Plant Protection ৫) Bio-Chemistry ৬) Tea Testing ৭) Engineering and Tea

Processing Research ৮) Agricultural Economics and Planning Statistics ৯) Water Technology & Irrigation। এ ছাড়াও বাগান পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণব্যবস্থা— এরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা ও বাগান পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নানা উপকেন্দ্রও স্থাপন করেছে। আসামের ডিব্রুগড় ও কাছাড়, ত্রিপুরার আগরতলা এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্র। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, কেরল ও কর্ণাটকও চা-বাগিচার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনে ওইসব রাজ্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার ফলে সেখানে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যা উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-সাম্রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। সেখানেও টি-বোর্ডের আর্থিক সাহায্যে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলার ভেলপরাই গ্রামে স্থাপিত হয়েছে চা-গবেষণাকেন্দ্র।

এই অভিযোগ তোলা মুশকিল যে, ভারতে চা-গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, চা-গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে চা-বিশেষজ্ঞর অভাব আছে বলে অভিযোগও তোলা যাবে না। টোকলাই চা-গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালনায় আছেন ড. মৃদুল হাজারিকার মতো চা-বিশেষজ্ঞ। এখানেই প্রশ্ন, ভারতের চা-শিল্প কেন তাহলে প্রযুক্তি ও চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না? এই দেশ থেকে অনেক পরে এসেও কেন শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, এমনকি ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলি ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করছে? এখানে সবই আছে। অভিজ্ঞ চা-বিশেষজ্ঞ আছেন। আছে পুরুষানুক্রমে দক্ষ চা-শ্রমিক, গবেষণাগার— অভাব উদ্যোগের। এখানে আছে লাল ফিতের বাঁধনের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির বেড়ি।

আসামের কার্বি আলং জেলা এবং কাছাড় জেলার বরাক উপত্যকায় যে প্রচুর পরিমাণে পার্পল টি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়, সেই তথ্যটি জানিয়েছেন টোকলাই টি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা শাখার প্রধান প্রদীপ বড়ুয়া স্বয়ং। শুধু তা-ই নয়, ওই চা নিয়ে তিনি যে গবেষণালব্ধ তথ্যও প্রকাশ করেছেন, সেখানে তো তিনি কেনিয়ার চা-বিশেষজ্ঞদের আগেই জানিয়েছেন ওই চায়ের ভেষজ গুণগুলির কথা। তাই একটা অভিযোগ উঠে আসে— ভারত থেকে পার্পল টি-র বীজ ক্লোন সংগ্রহ করে টোকলাইয়ের গবেষণালব্ধ তথ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেনিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যে সে দেশের চা-বাগিচা শিল্পে একে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজারে এমন সাফল্য পেল। আর ভারত কেন নিজেদের মাটির সম্পদকে এমনভাবে চিনতে পেরেও ব্যবহার করতে এগিয়ে এল না? এ ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধা ছিল কেনিয়ার থেকে অনেক বেশি। ওই চা-গাছের জন্ম থেকে উৎপাদনের স্বাভাবিক পরিবেশ তো ভারতের জল-বায়ু-মাটি। অথচ কেনিয়ার মাটিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নানা ধরনের গবেষণার মধ্যে গাছের ক্লোন নির্মাণ করে তার সাফল্যের জন্য ২৫ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

চায়ের বাজারে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত কালো বা ব্ল্যাক টি আন্তর্জাতিক বাজারদরের তুলনায় শুধু যে তিন থেকে চার গুণ দামে বিক্রি হচ্ছে তা নয়, এর চাহিদাও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এখন আসামসহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এই চা-চাষের প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। শুধু ট্র্যাডিশনাল চা-বাগিচায় নয়, সেখানে ছোট ছোট চা-বাগিচাতেও এই পার্পল টি চাষ শুরু হয়েছে। এই চা-বাগানের সুবিধা হচ্ছে, এর চাষ ও উৎপাদন ব্যয় যেমন সাধারণ চায়ের তুলনায় কম, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চাষ করা যায়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র চা-বাগান বা চাষের পক্ষে এই চা অত্যন্ত উপযোগী।

ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে, ভারতের চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারসহ আছে তার বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার। এ ছাড়া এ দেশে নতুন প্রজন্মের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নব প্রজন্মের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা পুরানো জিনিসের পরিবর্তে নতুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভারতের সাধারণ চা তার একই স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে প্রায় দু'শো বছর ধরে চা-প্রেমীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলেছে। চা শুধু ভাল হলেই চলে না, পানীয় হিসেবে প্রস্তুত করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। যেমন চা-বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, চা নিয়ে চায়ের টেবিলে আলোচনার জন্য রেখে না দিয়ে ছয় মিনিটের মধ্যে পান করা দরকার। কারণ চা লিকারের আদর্শ তাপমাত্রা হচ্ছে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আভেন থেকে সরিয়ে নিলে জলের এই তাপমাত্রা ৬ মিনিট পর্যন্ত বজায় থাকে। তারপর ওই তাপ মাত্র ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। চা তৈরির সর্বোচ্চ সময় নির্ধারিত করা হয়েছে দু'মিনিট। দুধ মিশিয়ে চা পান করতে হলে দুধের পরিমাণ ১০ মিলির বেশি হবে না।

চা পানীয় হিসেবে জনপ্রিয় হবার পিছনে আছে এক ধরনের বিচিত্র স্বাদ। এর গন্ধের মধ্যেও এক মন ভোলানো মাদকতা। কখনও গোলাপ, কখনও লেবু, আবার কখনও সবুজের এক অব্যক্ত সুগন্ধ। জলের চরিত্রের উপর সেই স্বাদ ও গন্ধের রূপ। ধরা যাক ৬ হাজার টাকা কেজি দরের (৩০-৩৫ হাজারের দামের চা হলেও একই কথা) দার্জিলিং চা কেউ কিনে এনে ভাবলেন, এবার পাবেন দার্জিলিং চায়ের সেই ভুবনমোহিনী ঘ্রাণ। যে কর্পোরেশনের জল বাড়িতে আসে, তাকে পানের উপযোগী করতে মেশানো হয় ক্লোরিন। এই জল ব্যবহার করে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্লোরিনের গন্ধ নাকে না লাগলেও দার্জিলিং চায়ের স্বাদ পেতে হলে সম্পূর্ণ গন্ধহীন জল প্রয়োজন। অথচ এই দার্জিলিং চা তৈরির আয়োজন বিশাল। লাল টি-পট। তাতে নাতিশীতোষ্ণ একবার ফুটানো জল। পটের জলের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে পশমের ঢাকনা বা টি কোজি। তার সঙ্গে মাপা দুধ ও চিনি। এত কিছু করেও কর্পোরেশনের জলের ক্লোরিনের গন্ধ দার্জিলিং চায়ের স্বাভাবিক গন্ধকে অনেকটা ম্লান করে দেবে। আজকের ইনস্ট্যান্ট কফি, ইনস্ট্যান্ট চা প্যাকেট যখন ঘরে ঘরে চলছে, তখন চা তৈরির এই ব্যাকরণ মেনে চায়ের প্রকৃত স্বাদের জন্য এই সময় কোথায়?

পার্পল টি এখানেই চা-বাজার মাতের ক্ষমতা রাখে। চায়ের সব স্বাদই পাওয়া যায় অথচ চটজলদি তৈরি করা যায়। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যচেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই চা-এর প্রচার সঠিকভাবে হলে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশীয় বাজারেও এই চায়ের চাহিদা যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, সেটা চা উৎপাদকরাই জানাচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গে ছোট ছোট জমিতে গড়ে উঠছে সেই চিরাচরিত চা-বাগান। এদের নির্ভর করতে হচ্ছে বড় সংগঠিত চা-বাগান মালিকের ফ্যাক্টরির চাহিদার উপরে। এখানে যদি এই চিরাচরিত চা-চাষের পরিবর্তে এই পার্পল চা-চাষের উদ্যোগ গ্রহণে সরকার ও টি-বোর্ড কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসত তবে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা একটা বিকল্প লাভজনক উপায়ের খোঁজ পেতে পারত। ভাবতে হবে বিকল্প ব্যবস্থাগুলি নিয়ে। দেখতে হবে, কেনিয়া পারলে আমরা কেন পারব না?

সৌমেন নাগ

আসামসহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এই চা-চাষের প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। শুধু ট্র্যাডিশনাল চা-বাগিচায় নয়, সেখানে ছোট ছোট চা-বাগিচাতেও এই পার্পল টি চাষ শুরু হয়েছে।

পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

এলাকাবাসীর সার্বিক উন্নয়নে দৃষ্টান্ত

গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত উন্নয়ন দপ্তর। একই পথে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতও এলাকা ও গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। পঞ্চায়েতের সদিচ্ছা ও সক্রিয়তায় আজ তা সাফল্যের সঙ্গেই সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্যই হল প্রত্যন্ত এলাকার মানুষগুলির চলাফেরা ও বেঁচে থাকায় স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসা। বিভন্ন কর্মসূচি, প্রকল্পের মাধ্যমেই সেগুলি বাস্তবায়িত করা হয়। সেই প্রকল্পের আওতায় পরে প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পাকা সেতু, স্বনির্ভর প্রকল্প, ঋণদান প্রকল্প ইত্যাদি।

পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর আবর্জনা মুক্ত এলাকা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়া একটি অন্যতম পরিকল্পনা। তার জন্য পঞ্চায়েত প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে। সংগৃহীত বর্জ্য পৃথকিকরণের পর তা থেকে জৈব সার তৈরির যে পরিকল্পনা পঞ্চায়েত নিয়েছিল আজ তা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে। নিজস্ব তহবিল এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ., আই.এস.জি.পি. ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রের অর্থ কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় ওই প্রকল্প থেকে এলাকার উন্নয়ন চলছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে বাইশগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

উন্নয়ন আর সংস্কারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাবাসীর সার্বিক সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করে।

তেরাভেরী মানাবাড়ি থেকে বাইশগুড়ি গ্রাম পর্যন্ত পাকা কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ চলছে

বাইশগুড়ি হাই স্কুলের পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ চলছে। খরচ আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা

উদয় সরকার, প্রধান, পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত, মাথাভাঙা

পর্যটনে সম্ভাবনাময় মাথাভাঙা মহকুমা

সুটুঙ্গা নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন

মাথাভাঙা শহরের অদূরে আমবাড়ি বনাঞ্চলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হতে চলেছে পিকনিক স্পট ও চিলড্রেন পার্ক। শহরের উত্তর-পশ্চিমে সুটুঙ্গা নদীর ধারে মনোরম পরিবেশে প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন বনমন্ত্রী। জানা গেল, চিলড্রেন পার্কে ভবিষ্যতে টয় ট্রেনের ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে ডিয়ার পার্ক। এ ছাড়া নদী পারাপারের জন্য ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে এই প্রকল্পে। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকা খরচ হবে মাটি ভরাটের জন্য। সরকারি কর্তারা পরিবেশবান্ধব পিকনিক স্পট ও পার্কের কথা বললেও নানা ধরনের পাখি ও জৈব বৈচিত্রে ভরপুর প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশুদ্ধতা কতটা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁদের বক্তব্য, জৈব বৈচিত্রে ভরপুর ওই এলাকা মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ফলে নানা ধরনের ফড়িং, প্রজাপতি, পোকামাকড় ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ওইসব পোকামাকড়, ফড়িং, প্রজাপতির খাদক হিসেবে নানা প্রজাতির পাখির আনাগোনা হয় সারা বছর। এ ছাড়াও টয় ট্রেনের দূষণে ও মাইক বাজিয়ে পিকনিকের আয়োজন হলে বনের পাখি পালিয়ে বাঁচবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। এ

বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে পক্ষীপ্রেমীদের মত। প্রসঙ্গক্রমে পরিবেশপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসুদের মত, গোটা মাথাভাঙা শহরটাই পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে। মানসাই ও সুটুঙ্গা নদী ঘেরা অপরূপ সুন্দর মাথাভাঙা শহরের মতো উত্তরবঙ্গে আর ক'টা শহর আছে বলা শক্ত। মাথাভাঙা শহরের চারপাশের মতো বৈচিত্রময় পরিবেশও যে খুব কম শহরেই পাওয়া সম্ভব, সে কথা হলফ করে বলা যায়। শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশার চাদরে মোড়া মাথাভাঙার মোহময়ী রূপ পর্যটনপ্রেমী মানুষকে রোমাঞ্চিত করে তুলবেই। কোনও শহর পর্যটন মানচিত্রে উঠে আসতে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, তার সবগুলোই এই ছোট্ট শহরে আছে। শুধু 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া'। কোনও এলাকাকে পর্যটনকেন্দ্রের তকমা পেতে হয় প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যময় হতে হবে, নতুবা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। মাথাভাঙা শহর ও সন্নিহিত এলাকায় এ দুটোই বর্তমান। প্রাকৃতিকভাবে মাথাভাঙা শহরটি নদী দিয়ে ঘেরা। চারপাশের প্রায় বৃত্তাকার বাঁধের জবরদখলকারীদের যথাযথ পুনর্বাসন দিয়ে বাঁধের সংস্কার করতে হবে। থাকবে পর্যাপ্ত বাতিস্তম্ভ জলের ফোয়ারা। বাঁধ বরাবর পাকা বা কংক্রিটের রাস্তা থাকবে। পর্যটকদের বসার জন্য থাকবে কংক্রিটের চেয়ার বা বেঞ্চ। পাড় বাঁধ সংস্কার করে আরও কয়েকটি কংক্রিটের ঘাট নির্মাণের প্রয়োজন আছে।

আব্বাসউদ্দিন সেতু থেকে সুটুঙ্গা ও মানসাইয়ের সংযোগ পর্যন্ত থাকবে বোটিং-এর ব্যবস্থা। এমনকি বোটিং চলতে পারে রেল সেতু পর্যন্ত। শহরের পুব দিকে নদী পেরিয়ে যে বিস্তীর্ণ দ্বীপভূমি তা জৈব বৈচিত্রে ভরপুর। চারদিকে জলরাশির মাঝে এই ভূখণ্ডে যদি বনসৃজন করা হয় এবং সেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকে, তবে তা পর্যটকদের আকর্ষিত করবেই। সঙ্গে মানসাইয়ের সুদীর্ঘ তটভূমি। শরৎকালে দীর্ঘ পঞ্চানন সেতুর দু'-পাশে কাশ ফুলের শোভা এবং সুটুঙ্গা নদীতে দুর্গা পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন ও নৌবিহার আলাদা আকর্ষণ মাথাভাঙার।

এ ছাড়া মাথাভাঙা শহরে রয়েছে রাজ-আমলে নির্মিত ১০০ বছরের গ্রন্থাগার ভবন, মাথাভাঙা হাই স্কুল, ছবিরুন্নেসা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মদনমোহন মন্দির, জামে মসজিদ, আশুতোষ হল (মাথাভাঙা ক্লাব), মহকুমাশাসকের দপ্তর ও আবাসভবন। শহর থেকে খানিক দূরে খলিসামারিতে রয়েছে সমাজসংস্কারক পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটা ও মিউজিয়াম। শীতলকুচিতে আছে খেন রাজবংশের শেষ সম্রাট কান্তেশ্বর নির্মিত বিশাল গড় ও পরিখা। এই গড়েই নির্মাণ চলছে রাজ্যের প্রথম কৃষি পর্যটনকেন্দ্র। পাশেই লালবাজারে আছে কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের লেখক তথা কোচবিহারের রাজকর্মচারী আমানাতুল্লা খানের বাসভবন ও তৎকালীন স্থানীয় রাজদপ্তর দেওয়ান-ই-খাস। শহরের পুব দিকে মাত্র তিন কিলোমিটারের মধ্যে আছে তেকুনিয়া ইকো পার্ক। তেকুনিয়া বনাঞ্চলের গভীরে রয়েছে খয়েরবন। মানসাই (জলঢাকা) নদীর তীর বেয়ে যার বিস্তার শিবপুর পর্যন্ত। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে মাইলের পর মাইল শুধু বেলাভূমি আর সবুজ বনভূমি, যেখানে নানা পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখিদের আনাগোনা। দেখা মেলে নীলকণ্ঠ, হুপো, শামুকখোল, চখা, চাতক, নর্দার্ন ল্যাপ উইং, ব্ল্যাক স্টর্ক ইত্যাদি নানা পাখি। আছে কাও ধনেশ পাখিও। সুটুঙ্গা নদীতীরে আনাগোনা করে শামুকখোল। দেখা মিলতে পারে শুশুকও। আর আছে রংবেরঙের প্রজাপতি। শহরের পশ্চিমে রয়েছে দমদমা প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। দমদমা ঝিলের মনোরম শান্ত পরিবেশ মনে প্রশান্তি এনে দেয়। তার পাশেই সৎসঙ্গ আশ্রম ও ভেষজ উদ্যান। আশ্রমের পরিবেশ মনে আলাদা অনুভূতি আনে। উপরি পাওনা হতে পারে ডিয়ার পার্কের হরিণ শাবকের দল। জামাইদহেই আছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। মাথাভাঙার অনেকটা অংশই সীমান্ত এলাকা। পর্যটকদের কাছে যা সবসময়ই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

পর্যটনকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যোগাযোগব্যবস্থা। রেল যোগাযোগ এখনও নিবিড় না হলেও, জেলা শহর কোচবিহার বা শিলিগুড়ির সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় বাস যোগাযোগ আছে। ঘোকসাডাঙা ছাড়াও এক ঘণ্টার দূরত্বে ফালাকাটা ও কোচবিহার রেল স্টেশন। তদুপরি মাথাভাঙা স্টেশনও অদূর ভবিষ্যতে চালু হয়ে যাবে। শহরে রাত কাটানোর মতো একটি হোটেল ও তিনটি হোটেল কাম ভবন আছে। আছে সরকারি বাংলো এবং মাড়োয়ারি ধর্মশালা। তবে মাথাভাঙা শহরকে পর্যটন শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে পৌরসভার। শহরের সৌন্দর্যায়ন ও শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পৌরসভার ভূমিকাই শেষ কথা। পুরসভা, পর্যটন দপ্তর ও বন দপ্তর মিলে যদি লক্ষ্যে স্থির থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন সত্যিই পর্যটক পা রাখবে মাথাভাঙার মাটিতে।

বরুণ সাহা

আব্বাসউদ্দিন সেতু থেকে সুটুঙ্গা ও মানসাইয়ের সংযোগ পর্যন্ত থাকবে বোটিং-এর ব্যবস্থা

অবহেলায় ডুয়ার্সের সবেধন টেরাকোটা মন্দির

কোচবিহার শহর থেকে কোচবিহার-দিনহাটা সড়কপথে ৬.৪ কিমি দূরত্বে ধলুয়াবাড়ি বা ধলিয়াবাড়ি গ্রামে সিদ্ধনাথ শিব মন্দির। পাকা সড়ক থেকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পথে মিনিটকয়েক পা ফেললেই পৌঁছে যাওয়া যায় ওই মন্দির চত্বরে। এই শিব মন্দিরটি কোচবিহার জেলার টেরাকোটা মন্দির। পোড়ামাটির ফলকযুক্ত এরকম শিব মন্দির কোচবিহার জেলায় দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের আর কোথাও এ ধরনের পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত মন্দির বিরল। কিন্তু সেটি আজ ধ্বংসের মুখে এক বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস। যদিও শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে আজও সাত দিনের একটি গ্রামীণ মেলা বসে।

একসময় ধলুয়াবাড়ি ছিল কোচ রাজাদের রাজধানী। সেই রাজধানীকে কেন্দ্র করেই নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ছিল ওই টেরাকোটা মন্দিরটির। কিন্তু রাজধানী কিছুদিনের মধ্যেই আবার কোচবিহারে চলে গেলে মন্দিরের কাজ অসমাপ্তই থেকে যায়। মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার রাজধানীর পাশে ধলুয়াবাড়িতে একটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করে (১৭১৪-৬৩ সাল) বসবাস শুরু করেন। তখন তিনিও একটি শিব মন্দির নির্মাণ করিয়ে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করবেন বলে ঠিক করেন। তবে তিনি ওই মন্দির নির্মাণকাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণও ওই মন্দির নির্মাণ করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনিও তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ এই মন্দিরের কাজ আবার শুরু করান এবং ১৮৪১ সালে বারাণসী থেকে নিয়ে আসা দু'টি শিবলিঙ্গের একটি এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও 'রাজোপাখ্যান' অনুসারে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ মন্দিরটি শুধু সংস্কারই করিয়েছিলেন।

অতীতে বাংলার মানুষ দেবতার মন্দির নির্মাণে মাটিকেই উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। কারণ, মাটি তাদের কাছে ছিল সহজলভ্য। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মাটি পুড়িয়ে মন্দির নির্মাণ হত। তা ছাড়া বাংলায় পাথর সহজলভ্য ছিল না। মন্দির অলংকরণে সহজ উপাদান হিসেবে তাই মাটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। পাল, সেন যুগের বাংলায় পাথরের প্রচুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সেসব পাথর বাংলার নয়। তোর্সা নদীর কাছে সিদ্ধনাথ শিবের এই মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন আকারের ছোট-বড় ইট।

মন্দিরের দেওয়াল প্রায় দুই ফুট চওড়া। মন্দিরটিতে দু'টি প্রবেশদ্বার আছে। চারদিকে প্রদক্ষিণের পথ আছে, যা খুব নতুন বলেই মনে হয়। মন্দিরটি চারকোনা, সোজা উপরে উঠে গেছে। চারদিকে ছাদের কার্নিশে সামান্য অলংকরণ আছে, যা খুব সাধারণ। মন্দিরটির উপরে চার কোণে চারটি রত্ন বা চূড়া আছে মাঝের অংশ ফাঁকা। প্রত্যেক চূড়ার মাথায় ত্রিশূল আছে, এমনকি ছাদের মাঝখানেও।

ছাদটি বাংলার খড়ের চালের বাড়ির মতো দু'পাশে নেমে গিয়েছে। চারটি চূড়ার কোনওটিতেও কোনও অলংকরণ নেই। পূর্ব ভারতের স্থাপত্যশৈলীর ছাপ যেমন এই মন্দিরে আছে, তেমনি বাংলার টেরাকোটা ও মোগল স্থাপত্যের মিশ্রণ ঘটেছে এই মন্দিরে। নির্মাণ-রীতিতে মুসলিম স্থাপত্যের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে নয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মিহিরাবের উপস্থাপন লক্ষণীয়। বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৮ সালে সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরটি পরিদর্শন করেছিলেন।

মন্দিরের সামনের দেওয়ালে খাঁজকাটা অনেকগুলি খোপ। ওই খোপগুলিতে রয়েছে পোড়ামাটির ফলক। আর সেই ফলকে আছে নানা ধরনের মূর্তি। মন্দিরের ফলকগুলির বিষয় পৌরাণিক হলেও লোকায়ত শিল্পও কিছু লক্ষ করা যায়। ৭৩টি পোড়ামাটির ফলক আছে যার মধ্যে আছে, গাছের ডালে বসা একজোড়া টিয়া পাখি, এরকম ৬টি ফলক। ফুল-লতাপাতার বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ করা ফলকের সংখ্যা ২৭টি। একদম নিচে দু'টি ফলক দেখতে পাওয়া যায় ইঁদুর, খরগোশ বা বেজির। প্রধান প্রবেশদ্বারের দু'পাশে মন্দিররক্ষক হিসেবে বন্দুক তুলে ধরে আছে দেশীয় (কোচসেনা) সেপাই, তাদের কানে বড় বড় দুল, মাথায় বাংলার টুপি, পরনে ধুতি, জামা। এছাড়াও আছে খড়্গ হাতে ও পানপাত্র হাতে সম্ভবত চণ্ডী বা কালী, চামর হাতে নৃত্যরত সেবক, দু'টি নৃত্যরত গন্ধর্ব, তিরধনুক হাতে যুদ্ধরত রাম, বীণাবাদনরত সরস্বতী ও কার্তিক, তরোয়াল হাতে যোদ্ধা, বন্দুক হাতে একজোড়া সৈনিক, দু'জন সখী, যারা মোগল বা রাজপুত রমণীদের মতো পোশাক পরে আছে ধনুক হাতে। মন্দিরের ফলকগুলিতে যে চরিত্রগুলি উঠে এসেছে, তাদের বেশির ভাগই পৌরাণিক চরিত্র হলেও, চতুর্ভুজ দেবতারা দ্বিভুজ হয়ে যে সাধারণ মানব, মানবী রূপ লাভ করেছেন, তাও বোঝা যায়। যেহেতু রাজ-অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত তাই এই মূর্তিগুলোতে প্রধানত রাজাদের ধর্মাচরণ বা ধর্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছে। মন্দিরের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সিদ্ধনাথ শিব। বিগ্রহটির উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট ২ ইঞ্চি। এ ছাড়া একটি নারায়ণ শিলাও আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করার মুখেই একটি টিনের ফলকে লেখা আছে, ধলুয়াবাড়ির ওঁ সিদ্ধনাথ শিব মন্দির হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নির্মিত ১৭৯৯-১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯৭২ সালে একবার মন্দিরটির সংস্কার করে। পরবর্তীকালে আর কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়নি। মন্দিরটি অনেকটাই মাটিতে ঢুকে গিয়েছে। বৃষ্টিপ্রবণ স্যাঁতসেঁতে কোচবিহারের আবহাওয়ায় মন্দিরটি দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকায় পূজা-অর্চনার খরচ ও বছরে শিবরাত্রির আগে একবার রং হয়, কিন্তু তা মন্দিরের ক্ষতি করে। শতাধিক বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে ইতিহাস কি তবে মাটিতেই মিশে যাবে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

প্রয়াত পৌরপতি বীরেন কুন্ডুর স্বপ্নকে বাস্তবায়
জনস্বার্থে কোচবিহার পৌরসভা যা করেছে এব

তোর্ষা নদী থেকে জল উত্তোলন ও শোধন করে বিশুদ্ধ পানীয় জল বাড়ি বাড়ি সরবরাহ প্রকল্পের কাজ আগামী ২০১৬ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। নাগরিকদের সেই পরিষেবা দেওয়া যাবে ২০১৬ থেকেই।

কোচবিহার শহরের শান্তিবন এলাকায় বাসস্থান ও সহায় সম্বলহীন ভবঘুরেদের জন্য নির্মিত হতে চলেছে আবাসন।

শহর সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে শুরু হয়েছে প্রধান রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ, ডিভাইডার নির্মাণ ও আধুনিক বৈদ্যুতিকরণ।

শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পাকা রাস্তা এবং সুষ্ঠু জল নিকাষী ব্যবস্থার জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে।

য়িত করতে
বং করতে চলেছে

কোচবিহার পৌরসভার কর্মযজ্ঞ

১) ব্লাড ব্যাঙ্ক— যা ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিচ্ছে।

২) জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ।

৩) ১০ নম্বর ওয়ার্ডে শিব দীঘিসহ গঙ্গা-বিষ্ণু মন্দির সংস্কার।

৪) নিবেদিতা একাডেমি নামে একটি স্কুল।

৫) সাইকেল ভ্যান দ্বারা বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ।

৬) চিলা রায় আবাসন, বিপাশা আবাসন, পারমিতা ভবন, প্রবাস আবাসন, দেশবন্ধু মার্কেট, সাঁইবাবা বাজারের আমূল নির্মাণসহ ভবানীগঞ্জ বাজারের আমূল সংস্কার।

৭) গান্ধিনগরে হরিজনদের জন্য ত্রিতল আবাসন নির্মাণ।

৮) বিল্ডিং সেন্টারের মাধ্যমে ওয়ার্ডের ছোট রাস্তাগুলি কংক্রিটের তৈরি করা।

৯) কর্মরত মহিলা আবাসন ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ।

১০) পানীয় জলের সুষ্ঠু বন্টনের জন্য তিনটি ওভারহেড রিজার্ভার (৩ নং, ১০ নং ও ১২ নং ওয়ার্ড) নির্মাণ।

১১) ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কার, শিশু উদ্যান, চারুকলা ভবন ও পবিত্র দাস স্মৃতি ভবন নির্মাণ।

১২) হরিশ পাল চৌপথিতে ক্লক টাওয়ার নির্মাণ।

১৩) শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ২৩টি চৌপথিতে উচ্চ আলোকস্তম্ভ নির্মাণ।

১৪) আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য একটি পে-লোডার (ব্যাক-হো সহ) এবং দুটি ট্রিপার ক্রয়।

১৫) শহরের বিভিন্ন স্থানে মহাপুরুষদের মূর্তি স্থাপন।

১৬) বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল নিকাশের লক্ষ্যে হাইড্রেন নির্মাণ।

১৭) পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ।

১৮) মিনিবাস, ছোটবাস ইত্যাদি যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত গাড়ির স্ট্যান্ডের সংস্কার।

১৯) শহরের দীঘিগুলির সংস্কার।

২০) ফুটবল ও ভলিবল দল গঠন।

২১) ১২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত খেলার মাঠটির (বাজারের মাঠ) সংস্কার।

২২) ১২ নম্বর ওয়ার্ডে হাইড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার।

২৩) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান ব্যবস্থা।

২৪) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স (অনুজ্ঞাপত্র) প্রদান ব্যবস্থা।

২৫) এছাড়াও IHSDP Phase-II প্রকল্পের ৩২০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।

কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত ঐতিহ্য ও পরম্পরার কোচবিহার রাসমেলা ২০১৫। প্রাণবন্ত এই উৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

রেবা কুন্ডু
চেয়ার পার্সন, কোচবিহার পৌরসভা

কোচবিহার পৌরসভা

ওপারের দস্যুদের মতোই এপারের ‘অন্ধা কানুন’ও কখনও রেয়াত করেনি ওদের

বহু যন্ত্রণা বুকে নিয়েও ছিটবাসী বলরাম বর্মন, গজেন বর্মন, মিজানুর রহমান, মহঃ খলিলুদ্দিন প্রমুখ ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য যে কত লড়াই, কত দরখাস্ত, কত স্মারকলিপি দিয়েছেন, তার হিসেব কেউ রাখেনি। ছিটবাসীদের সেই যন্ত্রণাময় জীবনকথাই ছিটকথার **ষষ্ঠ পর্ব**।

লড়াই অসমই বটে। সীমান্তরক্ষায় সদাসতর্ক বিএসএফ-এর ব্যাটেলিয়ন পরিবর্তন বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের মানুষদের এক কঠিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে তোলে। মাথাভাঙা ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কর্তৃক মনোনীত চার পঞ্চায়েত কর্তা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রের সাহায্যে ছিটগুচ্ছের বাসিন্দাদের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ ২০০৬ সালের পর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। বিএসএফ-এর নতুন ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডারের নির্দেশে বাঁশকাটার বাসিন্দাদের উক্ত পরিচয়পত্রের সাহায্যে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ ২০০৭ সাল থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মূল ভূখণ্ডে আসতে না পারার কারণে তাদের প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। ছিটবাসীদের দাবিদাওয়া সম্পর্কিত স্মারকপত্র সরাসরি জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছানো ক্রমশ দুরূহ হয়ে ওঠে। অথচ ভূমিদস্যুদের করাল দৃষ্টি থেকে তাদের নিস্তার নেই। অগত্যা অভাব-অভিযোগ জানানোর মাধ্যম কিংবা অবলম্বন হয়ে ওঠে স্থানীয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের কঠিন শৃঙ্খল তাদেরকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। অসহায়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তারা। এ যেন এক কঠিন সংকট ছিটবাসীদের জীবনে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। একদিকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতী, ভূমিদস্যু ও মৌলবাদী শক্তির রক্তচক্ষু, অন্যদিকে সীমান্ত জুড়ে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানদের বজ্রকঠিন মুখ। নির্বিকার দেশ শাসনের মহান কর্মে ব্রতী জনগণমন অধিনায়করা। রাজনৈতিক মহল প্রায় নিরুত্তাপ।

কথায় বলে, যার ভোট নাই, তার দাম নাই। ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের যেহেতু ভোটাধিকার অর্জিত হয়নি, সেহেতু তাদের নিয়ে আগ্রহ স্থানীয় স্তরের নেতাদের নেই বললেই চলে। কোনও ঘটনা ঘটলে সংবাদমাধ্যমে তাঁরা বক্তব্য দেন কিংবা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি তাদের কাছ থেকে বক্তব্য আদায় করেন সংবাদ সুখপাঠ করবার স্বার্থে। বক্তব্যদানকারীদের সিংহভাগ সম্পর্কে এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, ছিটমহল বিষয়টি কী কিংবা কোথা থেকে এর উৎপত্তি— তা তাঁরা জানেনও না। জানবার চেষ্টাও করেছেন বলেও মনে হয় না। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। তবে ব্যতিক্রম কখনওই উদাহারণ হতে পারে না। যা-ই হোক, সীমান্ত পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার লড়াই কখনওই বন্ধ করেনি ছিটমহলবাসীরা।

প্রচলিত পদ্ধতিতে মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হলেও অপ্রচলিত পথে যাতায়াতের মাধ্যমে তারা তাদের লড়াই জারি রাখে। সত্যিই এ এক অসম লড়াই। ঠান্ডা ঘরে বসে যাঁরা দেশের নীতি নির্ধারণ করেন, টেলিভিশনের পর্দায় মুখ উদ্ভাসিত করে যাঁরা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন, যাঁদের মুখ নিঃসৃত বাণী দেশবাসীর কাছে সম্পদস্বরূপ— তাঁরা একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন না ওই মানুষগুলোর জীবনযন্ত্রণার কথা। ছিটমহলের মানুষরা চেষ্টা করেছে কাগজ-কলমকে নির্ভর করে লড়াই জারি রাখতে। কাগজ-কলমই তাদের হাতিয়ার। কখনও আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে, কখনও অতি সংগোপনে পড়শি দেশের দু'-একজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় তাদের বক্তব্য দরখাস্ত আকারে লিখে বা টাইপ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এই দরখাস্ত বা দাবিপত্র কিংবা অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতেও তাদেরকে কখনও কখনও জীবন বাজি রাখতে হয়েছে। চোরা পথে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়িয়ে আসতে হয়েছে কোচবিহার কিংবা মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা বা দিনহাটায়। অঙ্কে একটু এদিক-ওদিক হলেই বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ে হাজতবাস কিংবা বেআইনি অনুপ্রবেশ অথবা চোরাচালানকারী সন্দেহে তপ্ত সীমায় জীবননাশ। এমনকি মূল ভূখণ্ডে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি হিসেবে ফর্টিন ফরেনার্স অ্যাক্টে গ্রেপ্তারেও হাজতবাস হয়ে উঠতে পারে ভবিতব্য। তারা যে বাংলাদেশি নয়, বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত ভারতীয় ছিটমহলবাসী— কে বোঝাবে আইনের রক্ষকদের? তাদের অধিকাংশ যে ‘ছিটমহল’ খায় না মাথায় দেয়, সেটাই তো জানে না কিংবা জানার চেষ্টাও করে না। বহু ভারতীয় ছিটমহলবাসীকে রুটিরুজির টানে সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থানসহ উত্তর ভারতে যাতায়াতের পথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী কিংবা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে শ্রীঘরে যেতে হত না, যদি তাঁরা ছিটমহল বিষয়টি একটু বোঝার চেষ্টা করতেন। একদা ইংরেজ আশ্রিত করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার রাজ্যের মহারাজার ‘পেটভাতা’ নামক রাজ্য খণ্ডসমূহ ‘রাজাওয়ারা’ নাম পরিগ্রহ করে দেশ বিভাজনের রাস্তা ধরে যে ভারতীয় ছিটমহল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, তার হিসেব রাখে ক'জন?

অথচ এরকম এক স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল ভারতীয় প্রশাসনের। বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল সতর্ক ও সংবেদনশীল পদক্ষেপের। অথচ রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ— কেউই ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না বিষয়টিকে। ভারতীয় ছিটবাসী কিংবা বাংলাদেশি, সকলের ক্ষেত্রেই এক বন্দোবস্ত, একই আচরণ, একই সাজা। প্রশ্ন হল, এটা কি কাম্য ছিল? কেন বিভিন্ন সময়কালে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ছিটমহলবাসীকে সীমান্ত অতিক্রম করার দায়ে বাংলাদেশি তকমায় ভূষিত করে মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, দিনহাটা কিংবা কোচবিহার সংশোধনাগারে দিন কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে? এটা কি তাদের প্রাপ্য ছিল? এর দায় কার? কে দেবে এর জবাব— প্রশ্নের উত্তর

এড়ানো হয়ত যেতে পারে। তবে সেটা সাময়িক। একদিন না একদিন মানুষ এর উত্তর খুঁজবেই। কারণ উত্তর খোঁজার পথ সরকারই বাতলে দিয়েছে। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব পর্যালোচনা করে ২০১৪ সালের ১ ডিসেম্বর লোকসভা ও রাজ্যসভায় যে রিপোর্ট পেশ করে, তাতে ছিটমহলের নাগরিকত্ব বিষয়ক মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যকে উদ্বৃত্ত করে প্রতিবেদনে উল্লিখিত অংশটি এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

2.30 The Home Secretary had further added during the course of the evidence, held on 29 October, 2014.

"...Now as far as the Indian population living in Bangladesh is concerned, they are our citizens and they have every right to come back. How many of them decide to exercise this right, we will find out once a decision is taken. But when they come back, we intend to take the biometric details of all of them and carry out the entire exercise to ensure that we know who all are coming.

Then in close cooperation and consultation with the Government of West Bengal, they will be taken to the respective places where they are proposed to be settled and there we will keep a close watch for some time. We will also set up our Police Stations/ Police Posts and generally keep a close watch on what is going on. Since they are Indian citizens returning to India, there really should not be a very serious security problem but as a matter of abundant canteen, we will take all measures that are required to be done."

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজনীতির জাঁতাকলে দশকের পর দশক তাদের যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক দল কিংবা দলের নেতা-নেত্রীদের একেক সময় একেক দৃষ্টিভঙ্গি ছিটমহলবাসীদের জীবনকে করে তুলেছে যন্ত্রণাময়। সেই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বলরাম বর্মন, গজেন বর্মন, মিজানুর রহমান, মহঃ খলিলুদ্দিন প্রমুখকে কত কিছুই না করতে হয়েছে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য। কত লড়াই, কত সংগ্রাম, কত কত দরখাস্ত, স্মারকলিপি; ভারতীয়ত্ব প্রমাণে ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা। কে শোনে কার কথা! দেশের রাজনৈতিক মহলের সময় কোথায় তাঁদের বক্তব্য শোনবার বা জানবার কিংবা বোঝবার! তারা চলে তাদের মতো। প্রায় সকলেই কেমন যেন ভোটপাখি!

অথচ চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি ভারতীয় ছিটবাসীরা। আবেদন-নিবেদন, দরখাস্ত চালাচালির পাশাপাশি ২০১০ সালে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ, বাঁশকাটা এলাকায় ভূমিদস্যুদের লাগামছাড়া সন্ত্রাস তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। ওই বছরের ১৮ জানুয়ারি ১১২ বাঁশকাটা ছিটমহলে বলরাম বর্মনের বাড়িতে ভয়ংকর আক্রমণ চালায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। ইতিপূর্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বলরামবাবুর পরিবার রাজাকারদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশের পর ছিটমহল ফিরে গিয়ে দেখেন তাঁদের ভূসম্পত্তি স্থানীয় বর্গাদারদের সঙ্গে নিয়ে রাজাকাররা দখল করে নিয়েছে। সেই থেকে রাজাকারদের সঙ্গে বলরামবাবুর পরিবারের বিরোধের সূত্রপাত হয়। সেদিনের রাজাকাররা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে ওই এলাকার বিএনপি-জামাত শিবিরের কেউকেটা। নবরূপে তারাই ভূমিদস্যু। বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের আদি বাসিন্দা রাজবংশী হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি আত্মসাৎ করতে ভূমিদস্যুরা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে প্রশাসনকে সুচারুভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

অন্যদিকে, ছিটবাসীরা এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে বারংবার ভারতীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও প্রশাসন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার স্পর্ধা দেখাতে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে কখনও বাংলাদেশ প্রশাসন, কখনও ভারতীয় প্রশাসনে দরবার করে ছিটবাসীরা একদিকে যখন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, তখন ভূমিদস্যুরা রং পালটে সব সময়ই শাসকদলের ছত্রছায়ায়। যা-ই হোক, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভূমিদস্যুদের হাতে বলরামবাবুর বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যাচার ছিটবাসীদের উত্তেজিত করে তোলে। তারা অহিংসভাবে তাদের যন্ত্রণার কথা ভারতীয় প্রশাসনকে জানাতে মাথাভাঙা সীমান্তে লং মার্চের ডাক দেয়। যদিও ছিটবাসীদের ভাষায়— মিছিল করে ব্লক অফিসে ডেপুটেশন। যাদের বাড়িঘর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে, তারা মিছিল অর্থাৎ লং মার্চ করবে, সীমান্ত অতিক্রম করবে, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে স্মারকলিপি পেশ করবে বিডিও-কে। মধ্যে সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বজ্র আঁটুনি, সেই সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরা। একেই বলে অসম লড়াই।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

রাসমেলায় ভেটাগুড়ি জিলিপি খেয়ে বুদ্ধি খুলে যাওয়ায় নিচের প্রহেলিকাগুলোর অর্থ বুঝতে পারলাম। বুঝলাম প্রতিটি শ্লোকই আসলে একটা করে 'নাম' বলছে আর নামের জায়গাগুলো ডুয়ার্সে। সে নাম হতে পারে জনপদের বা নদী বা পাহাড়ের বা অরণ্যের। তিন শ্লোকে তিন নাম। জিলিপি চিবিয়ে উদ্ধার করুন দিকি নাম তিনটে।

১
বিপ্লবীগণ সেথায় ছিল।
বাক্সে আকার সরিয়ে দিল।।

২
স্ট্যাচু যদি বয়ে যায়।
এইধারা নাম পায়।।

৩
ব্যাং তো এমন নয়।
লেফাফাও হয়।

৪
পটলরাম পর্যটক পুজোয় কোথায় ঘুরতে গিয়েছিল তা জানতে চাওয়ায় হাতে একটা পাথরের টুকরো ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই আগ্নেয় শিলা তা থেকেই এসেছে, বুঝলে?' আমি তো বুঝলাম। আপনি?

গত মাসের উত্তর

১) ডামডিম ২) গাজলডোবা ৩) সেবক ৪) জলঢাকা

উত্তরদাতাদের কেউই সব ক'টির সঠিক উত্তর পাঠাননি।

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

লালিগুরাস ডুয়ার্সের নতুন পিকনিক স্পট

মালবাজার থেকে চালসা হয়ে উত্তরমুখে ছুটতে ছুটতে রাস্তাটা মেটেলি বাজারে পৌঁছে যেন একটু জিড়িয়ে নেয়। ওই পথই আবার সাপের মতো এঁকেবেঁকে চড়াই ভাঙতে থাকে। চা-বাগিচার সবুজ ক্যানভাসের বুক চিরে আরও খানিকটা উত্তর দিকে গেলে সামসিং বাজার। এখানে না থেমে যদি আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে পৌঁছে যাওয়া যাবে মাল মহকুমার অন্যতম আকর্ষণীয় পিকনিক স্পট লালিগুরাস।

সামসিং-এর প্রবেশ দ্বারেই নেপালি কবি ভানুভক্তের আবক্ষ মূর্তি। এখান থেকে পথটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যে চলে গিয়েছে। তার একটি পথ সোজা সামসিং বাজার পেরিয়ে চলে গিয়েছে ডুয়ার্সপ্রেমীদের বহুল পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র সুন্তালেখোলায়। আর একটি পথ ডানদিকে বাঁক নিয়ে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গিয়েছে মূর্তি নদীর গা ঘেঁসা সুন্দরী লালিগুরাসে। নেপালি কবি ভানুভক্তকে একটা সেলাম ঠুকে লালিগুরাস পৌঁছে যান স্বচ্ছন্দে। দু'পাশের খাড়া দেওয়ালের মাঝখানে ছোটবড় অসংখ্য পাথরের টুকরো। তাদের গা ছুঁয়ে শিহরণ জাগিয়ে বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। নদীর ধারে এক চিলতে সমতল ভূমিতে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই নতুন পিকনিক স্পট লালিগুরাস।

পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সব আয়োজনই প্রায় সম্পূর্ণ। বসার জন্য বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য সিমেন্টের ছাতা এবং প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে শৌচালয়। ভানুভক্তের মূর্তির সামনে থেকে লালিগুরাস পৌঁছনোর রাস্তাটিও সিমেন্ট-কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে। যাতে সহজেই পর্যটকদের নিয়ে গাড়ি লালিগুরাস পৌঁছতে পারে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব চোখে পড়ছে লালিগুরাসের সর্বত্র। পিকনিক স্পটের অধিকাংশ জায়গায় ঝোপঝাড় আগাছা মাথা তুলেছে। যেখানে সেখানে খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক, ভাঙা বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নতুন পিকনিক স্পট, অথচ অপবিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। ডুয়ার্সে শীত এসে গিয়েছে। আর কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে বনভোজনের পালা। পর্যটক কিংবা পিকনিক পার্টিদের ভিড় উপচে পড়বে লালিগুরাসে। তাই আশা করি জেলাপরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসন অবিলম্বে লালিগুরাসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে উদ্যোগি হবেন।

সাতখাইয়া পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র ও বিশ্রামাগার

গত ৪ নভেম্বর মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মালবাজার আর চালসার মাঝখানে শালবাড়ি মোড় জাতীয় সড়কের পাশে নবনির্মিত সাতখাইয়া পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র ও বিশ্রামাগারের শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে নির্মিত মাটিয়ালী ব্লকের অন্তর্গত সুদৃশ্য এই পর্যটক সহায়তা কেন্দ্রটি এখন শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার অপেক্ষায়। বিশ্রামাগারের ভেতরে রয়েছে একটি ছোট্ট সুইমিংপুলও। এক দিকে বয়ে চলেছে নেওড়া নদী। অদূরে সবুজ পাহাড়, থেকে থেকে উড়ে যাচ্ছে টিয়ার ঝাঁক। শান্ত সমাহিত ওই প্রকৃতির কোলে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত পর্যটক নিতে পারেন কিছুক্ষণের বিশ্রাম। মন ভাল করে দেওয়া ডুয়ার্সের ওই পর্যটন কেন্দ্র যে উৎসাহিত করবে যে কোনও পর্যটককে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

সুধাংশু বিশ্বাস

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

১৪

রংপুর থেকে রাজীবলোচন মিত্র মাথাভাঙায় চলে এসেছিলেন স্রেফ রাগের মাথায়। পড়াশোনা ব্যাপারটা তাঁর ধাতে সইত না অথচ বাপ তো বটেই, ঠাকুরদা রামনারায়ণ মিত্র অবধি এ নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে রাজীবলোচন ডেপুটি হবে। অথচ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যখন রাজীবলোচন থার্ড ক্লাসে মনুমেন্ট হয়ে গেলেন, তখন তাঁকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করা হল। এর তিন দিনের মাথায় দেখা গেল রাজীবলোচন নিরুদ্দেশ। তিনি মাথাভাঙায় চলে এসে পাক্কা পাঁচ বছর বিস্তর মাথা ঘামিয়ে ভোটানে মাল আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় ভালমতো জাঁকিয়ে বসে তারপর বাড়িতে চিঠি লিখে নিজের নিরুদ্দেশ রহস্যে যবনিকাপাত করেছিলেন। পিতাকে লেখা সেই চিঠির একটি অংশে লেখা ছিল— 'আপনি পরমপ্রীত হইবেন জানিয়া যে আমার এক্ষণে বাঁশের ডাবল বেড়া দেওয়া টিনের চালের চারখানি কক্ষ এবং পাকা দালানে বৈঠকখানাসহ পূজা মন্দির নির্মিত আছে।' রংপুরে রাজীবলোচনের বাপ-ঠাকুরদার বাড়িতে তখনও দালান ওঠেনি। ফলে তিনি বাড়িতে প্রচুর আদরণীয় হয়ে ওঠেন। পিতা-পুত্রের মিলন ঘটে। তবে মাথাভাঙা ছাড়েননি রাজীবলোচন, বরং সেখানকার সাবডিভিশনাল আপিসের কর্মচারী সত্যেন বসুর মেয়েকে বিয়ে করে ব্যবসা আরও জমাতে শুরু করেছিলেন বলেই আজ গগনেন্দ্র মিত্র, তাঁর ছোট ছেলে জামালদহে এমন সাজানো জিনিস পেয়েছে।

গগন তাঁর তিন দাদার মতো লেখাপড়ায় মন দেয়নি। রাজীবলোচনের মনে হয়েছিল, ছোট ছেলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর নিজের গোটা রক্ত। তিনি গগনকে ছেলেবেলা থেকেই নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে জায়গা চিনতে হবে। সাহেব-বাবুরা যাকে ডুয়ার্স বলে, কোচবিহার রাজ্যের লোক তাঁকে বলে ভোটান। অনেকদিন ভুটানিরা এই অঞ্চল দখল করে রেখেছিল বলে এমন নাম। সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ভুটানিরা এখন এইসব এলাকা ছেড়ে দিলেও এই অঞ্চল দিয়েই মালপত্র আমদানি-রপ্তানি হয় সে দেশে। রাজীবলোচন রংপুর থেকে এই মাথাভাঙায় নিরুদ্দেশে এলেও সেটা গোড়ায় ছিল মাথা গোঁজার আস্তানা। তিনি কাজ শুরু করেছিলেন এই জামালদহ বন্দর থেকে। ভারী বিচিত্র জায়গা এই জামালদহ বন্দর। দক্ষিণ মুলুক থেকে ব্যবসায়ীরা মাল নিয়ে আসে এখানে। তাদের সঙ্গে মিলিত হয় উত্তরের ভুটান মুলুক থেকে মাল নিয়ে আসা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ভুটানে ঢোকার পথগুলো সব নির্দিষ্ট করা আছে। সেসব পথের কোনও একটা দিয়েই মাল নিয়ে ঢুকতে হবে সে দেশে। শুল্ক দিতে হবে ভুটানি রাজার লোককে। মাল নিয়ে যাওয়া-আসা করার ব্যাপারটা ভুটানে একেবারেই আলাদা। রাস্তাঘাট বলে কিছু নেই। গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি— সব অচল। কেবল লম্বা লম্বা কাশিয়া ঘাস আর জলা-জঙ্গলে ভরা এলাকা। হঠাৎ একটা-দুটো গ্রাম। লোকের তুলনায় জমি এত বেশি যে প্রচুর জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। সেখানে গোরু-মহিষের খাবার বিনে পয়সায় হয়ে যায় বলে গোরু-মহিষ-বলদ পুষতে কোনও অসুবিধা নেই।

রাজীবলোচন শুরু করেছিল একটা 'বলদিয়া এজেন্সি' খুলে। ভুটানের পথে মাল নিতে গেলে বলদ কি মহিষের পিঠের দু'দিকে দুটো বোঁচকা চাপিয়ে নিতে হবে। বলদ যারা নিয়ে যায়, তারাই বলদিয়া। অবশ্য রংপুর থেকে পাটগ্রাম হয়ে জামালদহ বন্দর ছুঁয়ে

কিন্তু সমস্যা হল, কোচবিহার নেটিভ স্টেট। এ রাজ্যে খোলাখুলি ইংরেজ বিরোধী কিছু করা সম্ভব নয়। রাজারা সেসব চান না। এর জন্য আদর্শ জায়গা হল জলপাইগুড়ি।

মোরংগা অবধি যাওয়ার জন্য ভুটান রোড ছিল। সে পথে গেলে একটু সুবিধা। কিন্তু ভুটানের একটা বা দুটো দুয়ার দিয়ে মাল আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করলে চলবে কী করে? রাজীবলোচন গোড়ায় ভুটান রোড ধরেইনি। সে বেছে নিয়েছিল দুর্গম কয়েকটা দুয়ারের রাস্তা। জামালদহ বন্দর থেকে সে ভুটানের দিকে পাঠাত চাল, চিঁড়ে, আটিয়া কলা। নিয়ে আসত মেচদের খেতে উৎপন্ন কার্পাস তুলো, ভুটানের কমলালেবু আর লাল হয়ে আসা শুকনো মাংস। হরিণের। রংপুর থেকে কেটে পড়ার কালে রাজীবলোচন ঠাকুরদার শখের সিঙ্গল ব্যারেলের বন্দুকটা নিয়ে যেতে ভোলেনি। বন্দুক ভালই চালাত। সেই এসবিবিএল বন্দুক চালানোয় রাজীবলোচনের দক্ষতা দেখে জামলাদহের কামিনী নিয়োগীর শালা তাকে বুদ্ধি দিল বলদিয়া দলের সঙ্গে গানম্যান হয়ে যেতে। প্রথমবার তা-ই হয়েই ভুটান গিয়েছিল রাজীবলোচন। ফিরেছিল তিনটে বাঘের চামড়া নিয়ে। পরের বারই নিজের বলদিয়া এজেন্সির হয়ে বলদ-মহিষ মিলে একশো মন মাল নিয়ে গিয়েছিল সেই দেশে। এর চার বছরের মাথায় সে মাথাভাঙায় জমি কিনে দালাল বানিয়ে বাবাকে চিঠি লেখে।

ছোট ছেলেকে এসবই হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছে রাজীবলোচন। বড় ছেলে ডেপুটি, মেজটি ডাক্তার হব-হব করছে। সামনেই সেজর বিয়ে, আর তারপরেই শ্বশুর তাকে পাঠাচ্ছে লন্ডনে। ব্যারিস্টার করতে। একটাই মেয়ে। জলপাইগুড়ি শহরে তার শ্বশুরবাড়ি। সেই সূত্রে জলপাইগুড়িতে যাতায়াত আছে গগনের। ম্যাট্রিক না দিলেও লেখাপড়ায় সে খারাপ ছিল না। কিন্তু তার পড়ার বিষয় হল কলকাতা থেকে দাদাদের পাঠানো আশ্চর্য সব কাহিনিমালার পুস্তক। মাথাভাঙার বাড়িতে লাইব্রেরি ঘরের তিনটে আলমারি বোঝাই হয়ে আছে সেইসব গ্রন্থে। রকমারি দেশের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি, মানুষখেকোদের মুখোমুখির হওয়ার বিচিত্র গল্প, জাহাজে চেপে অজানা দ্বীপে আটকে থাকার বিবরণ আর রহস্যময়ী শুভ্রবসনার গোয়েন্দা উপাখ্যান তার মাথায় দিনরাত্রি গুনগুন করে। সে ডুয়ার্সকে বাবার মতো ‘ভোটান’ বলে না। তার মনে হয় ডুয়ার্সের অরণ্য আসলে আফ্রিকার অরণ্য। এখানে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে নিত্য লড়াই। এই জামালদহ বন্দরেই তো প্রায় হানা দেয় বাঘেরা। ভালুক ইদানীং একটু কমে গেলেও বিশ্বাস নেই। বাবার বন্দুকটা নিয়ে সে হরিণ-শুয়োর মেরেছে। ব্যবসা সামলানোর পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চারের একটা ক্ষীণ আশা তার মনে সদাই ঘুরে বেড়ায় কেঁচোর মতো। কিন্তু সঙ্গী নেই। মাথাভাঙায় অনুশীলন সমিতির একটা গোপন আখড়া আছে। তার সদস্যদের সে চেনে। উপেনদা সেখানেই কুস্তি প্র্যাকটিস করতেন। উপেন বর্মন হল গগনের হিরো। মাথাভাঙা হাই ইংলিশ স্কুলে উপেনদার মতো সেও পড়েছে থার্ড ক্লাস অবধি। উপেনদা অবশ্য কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে ম্যাট্রিকে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন।

কিন্তু সমস্যা হল, কোচবিহার নেটিভ স্টেট। এ রাজ্যে খোলাখুলি ইংরেজ বিরোধী কিছু করা সম্ভব নয়। রাজারা সেসব চান না। এর জন্য আদর্শ জায়গা হল জলপাইগুড়ি। যদিও কোচবিহার শহরের তুলনায় জলপাইগুড়ি কিছুই না; কিন্তু সেখানে স্বদেশি করার বাধা নেই বলে প্রচুর উত্তেজনা। হরেক সভাসমিতি। বড় বড় নেতা এসে মিটিং করেন। শহরের প্রশাসনিক গুরুত্বও অনেক। বলতে গেলে জলপাইগুড়ি জেলার গা ঘেঁষেই তো মাজালদহ। কিন্তু এখানে সেইসব উত্তেজনা নেই। মাথাভাঙাতেও একই ব্যাপার। গগনের খুব আশা ছিল যে, কোচবিহারের রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করলে সে বন্দুক নিয়ে মাথাভাঙার মহকুমাশাসককে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য তার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

অথচ গগন নিজের হাতে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের জন্য যুগান্তর পত্রিকা কপি করে দিয়েছে। মানসাই নদীর অপর পারে গভীর জঙ্গলে পিস্তল ছোড়া অভ্যেস করেছে। নিশ্চয় সেসব কাজে কিছু পুণ্য হয়েছিল তার। তা না হলে আজ সকালে সে এমন একটা খবর পাবে কেন? জামালদহে তাদের আপিস একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে। একতলার আপিস আর দোতলায় গগন একা থাকলে প্রায় ছোটখাটো জমিদারের মতোই থাকে। বাবার আমলের তুলনায় এখন ব্যবসার ছিরিছন্দ বদলেছে। নতুন রাস্তা হয়েছে। চা-বাগানের কারণে ডুয়ার্সে অনেক জনপদ গড়ে উঠেছে। কুলি-মজুর-বাবুদের জন্য নতুন নতুন হাট হয়েছে কত। বলতে গেলে গোটা ডুয়ার্সে অনেক উত্তেজনা এসেছে, কিন্তু তার ছিটেফোঁটা ছিল না গগনের জীবনে। এখন তার বয়স মোটে সতেরো। বাবা পাত্রী দেখার কথা ভাবছে।

উত্তেজনার খবর এল সকালে। গগন তখন দোতলায় মস্ত বারান্দায় আরামকেদারায় গা এলিয়ে সূর্য-ওঠা দেখছিল। দোলপূর্ণিমার পরপর এখন সকালে শীতের তেজ আগের মতো নেই। গগন মুগার চাদর শরীর থেকে আলাদা করে দিয়ে দেখছিল সূর্যের ওঠা। কাকভোর থেকেই জামালদহ বন্দর জেগে গিয়েছে। গগন কাল বিকেলে মাথাভাঙা থেকে এসেছে কয়েকদিন থাকবে বলে। পাটগ্রাম স্টেশন থেকে জরুরি মাল খালাস করে পাঠাতে হবে কোনও একটি চা-বাগানে। তার কাগজপত্র নিয়ে সকালে লোক আসার কথা আটটা নাগাদ। ঠিক তার পনেরো মিনিট আগে এসে গগনের ডান হাত খেতু রায় এসে জানাল খবরটা।

রথেরহাট থেকে তারিণী বসুনিয়া একটি ছেলেকে পাঠাচ্ছে। তাকে জামালদহে রেখে ডুয়ার্স চেনাতে হবে। ব্যাপারটা অতি গোপনীয়। কেউ যেন অন্য কিছু টের না পায়। জামালদহে নিত্য বাইরের মানুষের যাওয়া-আসা। গগন নিশ্চয়ই সব কিছু ঠিকমতো করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই এই অভাবিত সংবাদে কাজকর্ম প্রায় চুলোয় উঠে গিয়েছে গগনের। আরেক দফা মাল পাটগ্রাম স্টেশনে না নেমে ভোটপট্টিতে নেমেছে কি না, সে খবর বিশেষ বিচলিত করল না তাকে। তারিণী বসুনিয়ার নির্দেশ তার কাছে অলঙ্ঘনীয়। সে ভাবেইনি যে তারিণী বসুনিয়ার মতো লোক তাকে মনে রেখে দিয়েছে। একবারই তো দেখা আর কথা হয়েছিল বোনের বউভাতে।

যে আসবে, তার নামও উপেন। কিন্তু সে কবে আসবে? উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে দু'দিন পাড় করে দিল গগনেন্দ্র মিত্র।

১৫

তিন মাস তারিণী বসুনিয়ার বাড়িতে কাটিয়ে উপেন অনেক কিছু শিখেছে। দিনগুলি সে কাটিয়েছে তারিণীর খাস কয়েকজন লোকের সঙ্গে। তাদের একজন হল ডাঙ্গালু রায়। ইয়া লম্বা আর তামাটে চেহারা। গায়ের রংটা আসলে ফরসাই ছিল এককালে। গায়ে মোষের মতো জোর। সওয়া মন ওজনের ধানের বস্তা দু'হাতে তুলে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে যেভাবে ছুড়ে ফেলে, তাতে মনে হয় এক পাউন্ডের মাখন ফেলছে। বাঘের ব্যাপারে তার প্রবল উৎসাহ। বাঘ ঠেঙিয়েই তার নাম হয়েছে ডাঙ্গালু। মানুষ সমান কাশিয়া ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বাঘ তাড়াতে গিয়ে সে উপেনকে শিখিয়েছে যে, বাঘের পালানোর জন্য একটা

মাথাভাঙা পৌরসভা পুরবাসীকে উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

- নদী থেকে জল তুলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প গ্রহণ করেছে পুরসভা। সেই প্রকল্পের সার্ভের কাজ শেষ করে দিল্লিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা। এর ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা দূর হবে।
- শীঘ্রই শুরু হবে মাথাভাঙা বাজারের আধুনিকীকরণের কাজ। ৬ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার।
- বাঁধ সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে বাঁধ বরাবর প্রায় ৩ কিমি পাকা রাস্তা তৈরি হবে। রাস্তার ধারে ফুলের বাগান, বাতিস্তম্ভ থাকবে। ১ ও ৫ নং ওয়ার্ডে দুটি বন দপ্তরের পার্ক হবে।
- চৌপথি ও শনি মন্দির এলাকায় দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। টেন্ডার সম্পন্ন।
- ঐতিহ্যবাহী নৃপেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাগার সংস্কারের কাজ চলছে।
- মালিবাগানের পুকুর সংস্কার করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- প্রাচীন শিব মন্দিরের সংস্কারের কাজ পুরোদমে চলছে।
- অর্ধসমাপ্ত আশুতোষ হলের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- কলেজ মোড়ে দুটি আধুনিক অথিতিশালা নির্মাণের কাজ চলছে।
- মাথাভাঙার সার্বিক নিকাশী ব্যবস্থা সুসংহত করতে মাস্টার প্ল্যান গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়।
- শহরের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট ও নিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে সারা বছরই।
- দায়িত্ব নেওয়ার সময় পৌরসভার ঘাড়ে ছিল প্রায় ২ কোটি টাকার ঋণ, অনুমোদন ছাড়া বিগত বোর্ড ওই কাজ করে। সেই ঋণ মেটানোর চেষ্টা চলছে। পানীয় জল সরবরাহের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় সমস্যা রয়েছে। চেষ্টা চলছে শীঘ্রই তিনটি নতুন পাম্প চালু করার। ই-টেন্ডার শুরু হয়েছে।
- বিগত পুরবোর্ড দীর্ঘদিন কোনও উন্নয়নের কাজ না করায় পৌর-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ২ কোটি টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে সীমিত সামর্থের মধ্যে উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাথাভাঙা পৌরসভা।

চন্দন কুমার দাস
ভাইস চেয়ারম্যান
মাথাভাঙা পৌরসভা

লক্ষপতি প্রামাণিক
চেয়ারম্যান
মাথাভাঙা পৌরসভা

দিক খালি রেখে তিনদিক দিয়ে তাড়াতে হয়। চারদিক আটকে দিলে বাঘ লাফ দেবে লোকের উপরে।

জলপাইগুড়ি শহরে থেকে উপেন এতদিন বোঝেইনি এই অঞ্চলের চরিত্র। এই তিন মাসে কিছু কিছু ধারণা হয়েছে। এমনিতে খাদ্যের অভাব নেই। প্রচুর মাছ, হরেকরকম ফল তো এমনিই পাওয়া যায়। লোকের তুলনায় জমি অঢেল। অভাব যেটা চোখে পড়ে তা হল কাপড়ের। গ্রামের সাধারণ মানুষ পুরুষ হলে কোমরে একটা বস্ত্র লেংটির মতো জড়িয়ে রাখে। মেয়েদের দেখেছে সে বুক থেকে হাঁটু অব্দি একটা কাপড়ে ঢেকে রাখতে। আস্ত ধুতি পরে রোজকার কাজ করে এমন লোকের পরিমাণ হাতে গোনা। গায়ে চাদর দেয়, যাদের আছে। সে চাদরের বেশির ভাগটাই এন্ডির। আসলে কাপড় কিনতে নগদ টাকা লাগে। তাই রেশম বা সুতির বস্ত্রে গা ঢেকে বার হওয়ার মতো লোক কম। শীতের রাতে আগুন পোহানোটা বরং সোজা এখানে। কাঠের তো অভাব নেই। চারদিকে অগণিত-অজস্র পাতা আর গাছের আড়ালে গ্রাম যে আছে বোঝাই দায়। যেন এক গাছপুর।

উপেন তিন মাসে একটু একটু করে বুঝেছে। স্থানীয় ভাষা বোঝার চেষ্টা করেছে। বন্দুকের টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে জঙ্গলের গভীরে। শীত-বসন্তের দিনগুলি কাটিয়েছে অভিনবত্বের উত্তেজনায়। সে কলকাতা শহর থেকে এসে থেকেছে তুলনায় ছোট হলেও আরেকটি শহরের পরিবেশে। গ্রাম সম্পর্কে তার যা ধারণা ছিল, এই জঙ্গলমুখর গ্রামটিতে এসে তার কোনও কিছুই মিলছিল না। রথেরহাট আর তার আশপাশের আমজনতা অবশ্য এটাই জানে যে, উপেন এখানে এসেছে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য। উপেনের শরীর একটু রোগাটে হওয়ায় লোকে মেনেও নিয়েছিল তা। মাস তিনেক পর যেদিন উপেন আবার বার্নিশ থেকে পাটগ্রামে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠছে, তখন তাকে খানিকটা স্বাস্থ্যবান মনেও হয়েছে। তবে বার্নিশে সে এসেছে একটা খাটো ধুতি পরে গায়ে চাদর জড়িয়ে। চপ্পল পরেনি। রং উঠে যাওয়া টিনের পুরানো বাক্সটা তারিণী দিয়েছেন। বার্নিশে পা দিয়ে উপেন দূরে তিস্তার দিকে তাকিয়ে ওপারের জলপাইগুড়ি শহরটাকে একবার দেখার চেষ্টা করেছিল। তিন মাস কোনও খবর পাঠায়নি। তার মানে কলকাতায় তার পরিবারের কাছেও কোনও সংবাদ নয়। জামালদহে সব কিছু ঠিকঠাক হলে সে জলপাইগুড়িতে একটা খবর পাঠাবে বলে ভেবে রেখেছে। টাকাও দরকার কিছু। এই তিন মাসে নিশ্চয়ই তার নামে কলকাতা থেকে নব্বই টাকা এসে জমেছে। তার বাবার টাকার অভাব নেই। উপেনের সে টাকা দরকার।

বার্নিশ থেকে রেলে পাটগ্রাম পৌঁছাল সে নির্বিঘ্নে। কেউ তাকে চিনছে না। ইচ্ছে করলে গোরুর গাড়ি চেপে আসতে পারত জামালদহে। কিন্তু গাড়িতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভেবে হেঁটে যাবে বলেই সিদ্ধান্তে এল। জামালদহে ধূলি-ধূসরিত হয়ে সে যখন বাজারের সামনে এল, তখন বেলা প্রায় শেষের দিকে। পশ্চিমে ছমছমে গাছপালার আড়ালে সূর্য তখন উধাও। অতিকায় এক শান্ত ছায়া ঢেকে ফেলেছে জনপদটিকে। চৈত্রের হাওয়া বইছিল একটু জোরে। গগনেন্দ্র তিনদিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একফালি জমিতে দাঁড়িয়ে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালানোর কাজে তদারকি করছিল। শেষে চৈত্র হাওয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করে হুকুম দিল আপিস ঘরের ভিতরে নিয়ে জ্বালাতে। তারপর আরেকজনকে হুকুম দিল পান আনার জন্য। উত্তেজনায় থাকলে সে পান খায়। অর্ধেক গুয়া সুপুরি দিয়ে একটা দেশি পান প্রায় ছাগলের মতো চিবিয়ে পাঁচ মিনিট পর থু করে ফেলে দেয়। একটু দূরে ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে বাতি জ্বালানোর ব্যর্থ চেষ্টা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি বললেন, 'কী যে পান খাও বাবা! বীণাপাণি ভাণ্ডারের মইনুদ্দিন তো একবার গালে পান ফেললে প্রহর কাটিয়ে দেয়।'

গগনেন্দ্র অপ্রস্তুতের মতো হেসে বলে, 'আসেন ঠাকুরমশাই। অ্যাই! বামুনের হুঁকো নিয়ে আয় তো একটা!'

তখনই পেছন থেকে কেউ ডাকল। পরিশীলিত স্বর শুনে এক ঝটকায় পেছনে তাকিয়ে গগন দেখল উপেনকে। আপাদমস্তক ধুলো মাখা উপেনকে দেখাচ্ছিল আমজনতার মতোই সাদামাটা। গগন বিরক্তির সঙ্গে কিছু একটা বলার জন্য তৈরি হতেই উপেন ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আয়াম ফ্রম তারিণী বসুনিয়া। ডিড ইউ হ্যাভ এনি মেসেজ?'

সেই তিন আলমারি বোঝাই বইয়ের একটায় ছিল লন্ডনের গোয়েন্দা পুলিশের কাহিনি। ছদ্মবেশ ধরতে তার মতো ওস্তাদ কেউ ছিল না ভবে। গগনের মনে হল, সেইরকম দক্ষতায় ছদ্মবেশে নিজেকে ঢেকে এসেছে উপেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফুটে উঠতে গিয়েও থমকে গেল সে। মনে পড়ল সেই ডিটেকটিভটার কথা। মৃত্যুর মুখেও শান্ত মনে চুরুট টানত সে লোকটা। গগনের হাতে চুরুট নেই। তবুও ডান হাতটা উঠে এল মুখের কাছে। কোনওমতে নিজেকে সামলে সে হাতখানা উপেনের বাড়ানো হাতের মধ্যে মিশিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আয়াম গগনেন্দ্র।'

পরক্ষণেই প্রায় ফেটে পড়ে আশপাশের সবাইকে ধমকের সুরে বলতে লাগল, 'আমার ফ্রেন্ড এসেছে! গুপ্তবাবু! এক্ষুনি বাজারে যান!'

বসন্তের অপূর্ব গোধূলিক্ষণে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে যাচ্ছে কীর্তনের সুর। একটু আগেই শেষ হওয়া নামাজের সুর যেন তার মুখ রচনা করে দিয়েছে। জামালদহ বন্দরের কোলাহলমুখর এলাকায় একে একে জ্বলে উঠছে লণ্ঠন, মশাল, প্রদীপ, কুপি, হ্যারিকেন, হ্যাজাক। মোষের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে রাজবংশী কিশোর দৌড়াচ্ছে লজেন্সের দোকানে। ক্রমশ সৌরালোকের শেষ বিন্দুটুকু উবে যাওয়ার পর আলো-আঁধার মাখা কীর্তনের সুরে ঝিমিয়ে যাওয়া বাজার যখন রূপ বদলাচ্ছে, তখন দোতলার ব্যালকনিতে উপেন বসে আছে ফিনফিনে ধুতি আর উৎকৃষ্ট মুগার চাদর গায়ে। সামনে সেগুন কাঠের টেবিলে পাতলা চিনেমাটির ধবধবে কাপে ততোধিক ধপধপে টি-পট থেকে গঙ্গাজলের মতো দেখতে চায়ের লিকার ঢেলে দিচ্ছে গগনেন্দ্র। সেদিকে তাকিয়ে উপেন। ছোকরা চায়ের ব্যাপারটা বোঝে। জলপাইগুড়িতে মামা একদিন কয়েকরকম চা বানিয়ে খাইয়েছিলেন উপেনকে। সেদিনই সে জেনেছিল ওই এলেবেলে চেহারার লিকারটাই ছিল সেরা। এর এক পাউন্ডের যা দাম, তাতে জামালদহ বন্দরের অনেক পরিবারের সারা মাসের খাওয়া হয়ে যায়। কথাটা মনে হতে উপেনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। নিজের পরনের পোশাক, চায়ের আয়োজন, চকচকে পালিশ করা কাঠের মেঝে, মোমবাতি সাজানো স্ফটিকের পাত্র দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস গোপন করল সে। হয়ত ভাবল যে, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এই ধুতি-চাদর-চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাঁটলে সে পথ শেষ হবে সম্ভবত তাঁর নিজের বাড়িতে।

—নাউ টেল মি উপেন! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু?

উত্তেজিত গগনেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে উপেন শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোনও দিন বোমা বানিয়েছ গগন?'

অর্ধেক জামালদহ গ্রামে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে রাজীবলোচনের ছেলের বন্ধুর কথা। কীভাবে একটা হাটুরে লোক ফটাফট ইংরেজি বলল! হ্যান্ডশেক করল! এতদিন সবাই জানত রাজীব মিত্রর ছোট ছেলে তার দাদাদের মতো গাদা গাদা পাশ দিতে ব্যর্থ তাই ব্যবসায় এসেছে! কিন্তু আজ তো এক বাজার লোক শুনেছে তার ইংরেজি! ভাবো একবার! একটাও তেমন পাশ না দিয়েই যদি এই ইংরেজি বার হয়, তবে দাদাদের মতো পড়লে নির্ঘাত সাহেব হয়ে যেত ব্যাটা!

তাই সেই রাতেই জামালদহ বন্দরের অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, রাজীব মিত্রর ছোট ছেলেটাই সেরা!

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

(চলবে)

অঙ্কন: সুবল সরকার

বসন্তপথ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

(**আগে যা ঘটেছে**— তিথি তার বন্ধুদের মতো কেবলমাত্র কেরিয়ার গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভোর নয়। তিথি সুমনকে ভালবাসে। তাই নিজের পরিচিত অভ্যস্ত নিরাপদ পরিবেশ, সমস্ত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আর্তি তুচ্ছ করে তিথি এগিয়ে এসে হাত ধরে তার ভালবাসার মানুষটির। ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত গ্রাম পাতাঝোরায় শুরু হয় তাদের যৌথ জীবন। উৎপলেন্দু-মিমি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নন সুমনকে। মেনে নিতে রাজি নন তিথির মামা দীপকও। দীপকের স্ত্রী তুলি পারিবারিক চাপে অসহায়। হেডমাস্টার মধুসূদন পাতাঝোরাকে অন্তর থেকে ভালবাসেন। পঞ্চায়েতপ্রধান ইয়াসিন সুমনকে তাদের রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখ্যান করে সুমন। ভোররাতে সাপের স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে তিথি। পরদিন সকালে উৎপলেন্দু সুমনের ফোন পান, তিথি আর নেই। মিমি অজ্ঞান হয়ে যান। নার্সিং হোমে মিমিকে রেখে উৎপলেন্দু রওনা হন পাতাঝোরার উদ্দেশে। তিথির শব দেখে ভেঙে পড়েন, সুমনদের সঙ্গে শ্মশানে যান উৎপলেন্দু। সুমন, যোগমায়ার সঙ্গে পরিচিত হন, আলাপ হয় মধুসূদন আর ইয়াসিনের সঙ্গেও, পাতাঝোরা জায়গাটা উৎপলেন্দুকে আবিষ্ট করে ফেলতে থাকে একটু একটু করে। দীপকের সঙ্গে ফোনে কথা হয় উৎপলেন্দুর। জানতে পারেন, তিথির বন্ধুদের সঙ্গে ভোরবেলা তুলিও রওনা হয়েছেন পাতাঝোরার দিকে। তারপর...)

৩৬

আকাশ ড্রাইভারের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল, গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও। ঘ্যাস্‌স্ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গিয়েছে ড্রাইভার। পথের দু'দিক ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল। উইন্ডস্ক্রিনের ওদিকে দেখা যাচ্ছে সেই কালো সরু পথ আগলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দুটো দাঁতাল হাতি। আকাশদের এসইউভি গাড়ি থেকে বড় জোর পঞ্চাশ মিটার দূরে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে নীল। উত্তেজনায় ধকধক করছে বুক। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে ফোটো তুলছে বিশালকায় ঐরাবতযুগলের। তবে ছবি তোলার জন্য বেশিক্ষণ সময় পাওয়া গেল না। কয়েক মিনিট পর আলগোছে নীলদের গাড়ির দিকে একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখ ঘুরিয়ে নিস্পৃহভাবে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে সিঁধিয়ে গেল দাঁতাল দুটো।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রাস্তার বাঁ ধারের জঙ্গলের দিকে। হাতি দু'টোকে দেখা যাচ্ছে না আর। চোখ ফিরিয়ে তুলি বললেন, ঝাড়খণ্ডে হাতিদের গতিপথ নিরাপদ করার জন্য আন্ডারপাস তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের রাজ্যও শিক্ষা নিতে পারে। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল লাইনে প্রতি বছর বহু হাতি মারা যায়। ট্রেনচালকদের জন্য ওভারপাস বা আন্ডারপাস বানানো উচিত।

অলিভিয়া বলল, সেদিন ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলে দেখছিলাম, কানাডার বিখ্যাত ট্রান্স-কানাডা হাইওয়ে পাঁচশো মাইল লম্বা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। সেই জঙ্গলে আছে অজস্র ভালুক, হরিণ, নানারকম জন্তু। সেই বিশাল চওড়া রাস্তা পার হবার জন্য কয়েক মাইল অন্তর ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলো গাছ-লতাপাতা দিয়ে এমন করে ঢাকা যে, জন্তুজানোয়ারদের সেগুলোকে প্রাকৃতিক পথ বলেই মনে হয়।

দিয়া বলল, ওভারপাস ওই বিশালকায় হাতিদের জন্য উপযুক্ত হবে না। হাতিদের যাতায়াতের করিডর যেখানে যেখানে আছে, সেখানে দরকার আন্ডারপাস। ডুয়ার্সে ঠিক ঠিক জায়গায় কিছু আন্ডারপাস তৈরি করলে শুধু হাতি কেন, অন্য জীবজন্তুদেরও প্রাণ বাঁচবে।

মসৃণ কালো সড়ক ধরে গাড়ি ছুটছে আবার। আকাশ ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে। মাঝের সিটে দিয়া, অলিভিয়া আর তুলি। একদম পেছনে নীল। এবার আর পথের দু'দিকে নয়, একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে টলটলে জলের একটা ফিতে নদী। সেই নদীর উপর দিয়ে অদ্ভুত নীল ডানার একটা পাখি উড়ছে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

আজ আর বৃষ্টি হচ্ছে না। তবে পুব আকাশে ধূসর মেঘ জমে আছে। ভোরের দিকে আলোতে মিশে আছে বিধুর বিষণ্ণতা। এই ভোর বুঝি পরম বেদনার। এই ভোর বুঝি আকুল করা সন্তাপের। তুলি অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। হঠাৎ বললেন, আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম জানো।

দিয়া বলল, কী দেখলে মামি?

তুলি মৃদু গলায় ড্রাইভারকে বললেন, গাড়িটা থামাবে ভাই?

গাড়ি দাঁড়াল তুলির অনুরোধে। সকলে নেমেছে গাড়ি থেকে। তুলি আঙুল উঁচিয়ে বললেন, ওই যে নীল পাখিটা নদীর উপর দিয়ে এতক্ষণ আমাদের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ছিল, আমি স্পষ্ট দেখলাম পাখিটা ধুপ করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ওই যে ঠিক ওখানে।

গাড়ি থেকে নেমে জলের দিকে তাকিয়ে আছে প্রত্যেকে। বাস্তবিকই কয়েকটা নীল পালক ভেসে ভেসে যাচ্ছে জলের উপর দিয়ে।

নীল অস্ফুটে বলল, ওগুলো তো পালক। পাখিটার শরীরটা কোথায়?

তুলি পরম বিস্ময়ে বললেন, পাখিটা এমন করল কেন?

অলিভিয়া আর দিয়া গলায় বিভ্রান্তি মিশিয়ে বলল, সত্যিই তো, পাখিটা এমন করল কেন? পাখিটা কি আত্মহত্যা করল?

সকলে নির্বাক। কোমরে হাত দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আকাশ বলল, আত্মহত্যা ব্যাপারটা যে সবসময় খুব স্পষ্ট তা নয়। হত্যা, মৃত্যু আর আত্মহত্যার মধ্যে স্বেচ্ছামৃত্যু বলেও একটা ব্যাপার থাকে।

দিয়া মুখ ফিরিয়ে বলল, মানে?

আকাশ অস্ফুটে বলল, এক ধরনের সাদা ইঁদুরের কথা শুনেছি, পালকে পাল ছুটতে ছুটতে এসে নদীতে ঝাঁপ দেয়। এ দেশে, ইউরোপেও ঘুগরা পোকার মতো কিছু পোকা আছে, যাদের সিকেডো বলে, সতেরো বছর পরপর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে তারা, কয়েক মাস বাঁচে, বংশবিস্তার করে, তারপর তাদের লাখে লাখে মৃত্যু হয়।

তুলি অচেনা স্বরে বললেন, তিথিও নিজের সমস্ত যন্ত্রণা আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছিল এতদিন। ওই নীল পাখিটা যেমন একটু আগে মুছে গেল আমাদের চোখের সামনে থেকে, তেমনি সারা পৃথিবীর উপর গোপনীয়তার কালো পর্দা ফেলে তিথিও তো মিলিয়ে গেল। আমরা তো কিছুই করতে পারলাম না।

দিয়া মোবাইল ফোন ঘেঁটে ফেসবুক খুলেছে। তুলির দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে আবছা গলায় বলল, এই দেখো মামি। পাতাঝোরা যাবার আগে পর্যন্ত রেগুলার ফেসবুক করত তিথি। সে সময়ের সব ছবিগুলো একবার দেখো। ওর ফেসবুকের পাতায় হাসিখুশি তিথি আজও আমাদের সঙ্গে জুড়ে আছে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব আছে। সত্যিকারের জীবনকে সে পাত্তা দেয় না। তুলি দিয়ার ফোনটা হাতে নিয়ে তিথির ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলেন একটুক্ষণ। চশমার কাচে বাষ্প এসে জমল, তুলি কেঁদে ফেললেন ফুঁপিয়ে।

মিমি নার্সিং হোমে রয়েছেন এখনও। আইসিইউ থেকে কেবিনে শিফ্‌ট করা হয়েছে মিমিকে। দীপক ওখানে রয়েছেন দিদির দেখভালের জন্য। উৎপলেন্দু পাতাঝোরা থেকে কাল সকালে ফোন করেছিলেন দীপককে। মিমিকে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু দীপক কাল রাতে দুঃসংবাদটা জানিয়েছেন স্ত্রীকে। তুলির মুখ থেকে খবর পৌঁছে গিয়েছিল তিথির বন্ধুদের কাছে।

তখন অন্ধকার ঘনিয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে মুশলধারে। সে জন্য ঠিক হয়েছিল আজ ভোর থাকতে থাকতেই পাতাঝোরায় রওনা দেবে তিথির বন্ধুরা। তখনই তুলি মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন যে, পাতাঝোরায় যেতেই হবে তাঁকে। তুলি ভেবেছিলেন, দীপক হয়ত বরাবরের মতো রেগে যাবেন। কিন্তু তুলিকে অবাক করে দিয়ে দীপক তুলির কাঁধে হাত রেখে দুর্বল গলায় বললেন, সাবধানে যেয়ো।

রাস্তা একটু খারাপ এখন। উঁচু-নিচু কাঁকর

তখন অন্ধকার ঘনিয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে মুশলধারে। সে জন্য ঠিক হয়েছিল আজ ভোর থাকতে থাকতেই পাতাঝোরায় রওনা দেবে তিথির বন্ধুরা। তখনই তুলি মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন যে, পাতাঝোরায় যেতেই হবে তাঁকে। তুলি ভেবেছিলেন, দীপক হয়ত বরাবরের মতো রেগে যাবেন।

বিছানো রাস্তা। গাড়ি চলছে শ্লথ গতিতে। নীল বলল, ফরাসি কবি ঝাক রুবোর কথা পড়েছিলাম। বেশি বয়সে এলিক্স নামে এক তরুণীকে ভালবেসে বিয়ে করেন রুবো। এলিক্স নিজেও শিল্পী, লেখেনও অল্পবিস্তর। এলিক্স একদিন আচমকা অসুস্থ হলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে মারা গেলেন। এলিক্সের আচমকা চলে যাওয়ায় রুবো মৌন হয়ে গেলেন। লেখালেখি বন্ধ। তিন বছর পর একটি বই লিখলেন এলিক্সের উদ্দেশ্যে। শরীর কী? কালো কী? অনুপস্থিতি কী? আজও রুবো তার উত্তর খোঁজেন। তাঁর উচ্চারণ ফিসফিসিয়ে বলে যায়—

কোথায় তুমি?
কে?
এক বিষয়বস্তুহীন প্রতিকী অশরীরী কণ্ঠস্বর
এই মাটি
যা তোমার গায়ে লাগে
এই পৃথিবী
যার থেকে তোমায় এখন কেউ বিচ্ছিন্ন করে না।

শেষে এসে নীলের গলা একটু কেঁপে গেল। বাকি পথ কেউ কোনও কথা বলল না।

পাতাঝোরা বাজারে আকাশদের গাড়িটা এসে দাঁড়াল যখন, রোদ্দুর একটু কড়া হয়েছে। এদিক-ওদিক থেকে উৎসুক কয়েকজন লোক চলে এসেছে গাড়ির কাছে। লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা একজনের কাছে সুমনদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল আকাশ।

লোকটা গাড়িতে বসা প্রত্যেককে জরিপ করে বলল, আপনারা?

অলিভিয়া জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমরা তিথির বন্ধু। আপনি কি সুমন রায়ের বাড়ি চেনেন?

লোকটা বলল, আমার নাম নিরঞ্জন সরকার। সুমনের বাবার আমল থেকে আমি রায় বাড়ির সঙ্গে সুখে-দুঃখে আঠার মতো জুড়ে আছি। আজ তিথি মায়ের কাজ। দশকর্মা ভাণ্ডারে এসেছিলাম কিছু জিনিস নিতে। এখন ফিরছি।

আকাশ একবার মুখ ফিরিয়ে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। তারপর আবছা হেসে বলল, ভালই হয়েছে, আপনাকে পেয়ে গিয়েছি। আমাদের গাড়িতে উঠে আসুন। দয়া করে আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে চলুন।

৩৭

কালো হয়ে আসছে আকাশ। মেঘ নামছে পাতাঝোরার উপর। তুলি গাইছেন ধৈবত বর্জিত রাগের বন্দিশ।

‘রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বুঁদন বরখে, তাসোই
সোহাবন মন ভাবন শাবনকি ঋতু মোরে সজনুবাঁ।’

মল্লারের খেয়ালেই যেন একটার পর একটা খুলে যাচ্ছে মেঘের ডানা-ভাঁজ। মেঘদূত মহল্লার হাওয়ায় গায়ে ভেসে ভেসে বৃষ্টি নামল পাতাঝোরায়।

বাড়ির উঠোনে একটা চেয়ারে সাদা কভার দেওয়া। তিথির ফোটো রাখা আছে সেই চেয়ারে। পুরোহিত চলে গিয়েছেন একটু আগে। এদিকটা এখন নিরিবিলি। উঠোনে তিথির ফোটো সাজানো চেয়ারটা ঘিরে বসেছেন উৎপলেন্দু, তুলিরা। মাথার উপর দুটো বড় ত্রিপল দেওয়া আছে। ফলে উঠোনে জল পড়ছে না। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে বাইরে।

কয়েকজন শ্মশানযাত্রী আর কিছু আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশী— সাকুল্যে শ’খানেক নিমন্ত্রিত। তাঁদের পঙ্ক্তিভোজনের ব্যবস্থা বাড়ির উলটোদিকের জমিতে। ওদিকটায় গিয়ে অতিথি আপ্যায়নের কর্তব্য করতে হচ্ছে সুমনকে। মাঝে মাঝে আসছে এদিকে। সুমন দাড়ি কামিয়েছে। উলোঝুলো চুল ছিল। সেই চুল ছেঁটেছে ছোট করে। সুমনকে দেখছিলেন উৎপলেন্দু। মাথায় নানারকম ভাবনা এসে ঘাই মারছিল। তাঁর ঘোর ভাঙল যোগমায়ার গলার স্বরে। যোগমায়া বললেন, কিছু খেলেন না আপনি?

উৎপলেন্দু নিজের মধ্যে ফিরে এসেছেন। হাসার অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, সকাল থেকে দু’-চার গ্লাস শরবত খেয়েছি। দই-মিষ্টিও খেয়েছি। খিদে চাপা পড়ে গিয়েছে।

সুমন ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছিল। উৎপলেন্দুর সামনে এসে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠিত মুখে বলল, আপনার চেহারাটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। শরীর ঠিক আছে তো?

উৎপলেন্দু বললেন, শরীর ঠিকই আছে। সমস্যা হয়েছে মনটাকে নিয়ে। তিথি বিয়ের পর আমাদের কাছে হয়ত ঠিক ছিল না। কিন্তু তিথি ছিল আমাদের প্রতিদিনের অনুভবে। অবচেতন মনে একটা আশ্বাসবোধ ছিল যে, একদিন না একদিন হয়ত আবার জোড়া লেগে যাবে দুটো সংসার। কিন্তু তা আর হল না।

যোগমায়া সহানুভূতির স্বরে বললেন, এর পর আপনি অফিসে সময় কাটাবেন যতক্ষণ, কাজ দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার একটা সুযোগ থাকবে আপনার। কিন্তু তিথির মায়ের হবে মুশকিল।

উৎপলেন্দু বললেন, সেটাই তো এখন আমার একমাত্র ভাবনা। মিমি যে এখন কেমন করে কাটাবে এক একটা নিস্তরঙ্গ দিন— কে জানে! মিমির উপরটা রুক্ষ। সেটাই দেখে সকলে। কিন্তু আমি তো ওর ভেতরটা জানি। মেয়েকে যে বড্ড ভালবাসত মিমি!

সুমন একটু ইতস্তত করে বলল, এদিকের কাজ তো মোটামুটি গুছিয়ে নেওয়া গেল। বাকিটা মা-ই সামলে নিতে পারবে। তা ছাড়া নিরঞ্জনকাকা তো আছেই। এবার আমি ভাবছি আপনার সঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে ঘুরে আসি একবার। অন্তত নার্সিং হোম থেকে যতদিন তিথির মা ছাড়া না পাচ্ছেন। ওখানে আমার বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানেই গিয়ে উঠব।

উৎপলেন্দু অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, বন্ধুর বাড়িতে উঠবে কেন? আমাদের এত বড় বাড়িটা পড়ে আছে। সেখানে থাকলে কি তোমার অসুবিধা হবে খুব?

সুমন থতমত খেয়ে বলল, তা নয়, তবে...।

উৎপলেন্দু গলায় কর্তৃত্ব নিয়ে বললেন, আমাদের ওখানেই গিয়ে উঠবে। দু’জন একসঙ্গে নার্সিং হোম যাতায়াত করা যাবে।

সুমন কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে বলল, আচ্ছা।

তুলি এবার ধরলেন, ‘চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে’।

তুলির পাশে একটা চেয়ারে স্থিত হয়ে বসে রয়েছেন উৎপলেন্দু। গানের বাণী বুকে শেল হয়ে বিঁধছে, মুখ-চোখ মেঘলা উৎপলেন্দুর। প্রথম গান শেষ হবার পর তুলি ধরলেন, ‘একদিন কোন হাহা রবে/ সুর হারায়ে গেল পলে পলে/ আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে’।

স্থায়ী থেকে অন্তরায় ছড়িয়ে পড়ছে তুলির মেঘমন্দ্র উচ্চারণের সম্মোহন। কোথাও ঘুরে ঘুরে এক লাইন বারবার গাইছেন, কখনও সুরের রেশ টেনে, বেশি মাত্রা নিয়ে গাইছেন। যেন বৃষ্টি-হাওয়ার নেশা পাক খেয়ে ঘুরছে পাতাঝোরার উপর দিয়ে।

বেশ খানিকক্ষণ গান গাইবার পর একসময় থামলেন তুলি। রুমাল দিয়ে চোখটা ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন একবার।

সুমন ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখটা নিচু করে রেখেছে। আকাশ, দিয়া, অলিভিয়া, নীলের মুখ-চোখ কান্না ভেজা। উৎপলেন্দু মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, তুমি আমার মন খারাপ করে দিলে। মনের মধ্যে একটা আলোও জ্বেলে দিলে। তুমি গান গাও জানতাম। কিন্তু এত ভাল গাও, সেটা আজ জানলাম।

নীল বলল, তিথি আমাদের সবচাইতে ভাল বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব তো শুধু একদিনের নয়, সেই ছোটবেলা থেকে। তিথি বিয়ে করে পাতাঝোরায় চলে আসার পর ওর সঙ্গে যোগাযোগের সুতোটা খানিকটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। পাতাঝোরায় মোবাইলের টাওয়ার নেই। সুমনদার বাড়িতে ল্যান্ডফোন নেই। তিথির সঙ্গে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা কমে যাবার সেটাই বড় কারণ।

আকাশ অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বলল, বেশ কিছুদিন ধরেই আমরা পাতাঝোরায় আসব আসব করছি। কিন্তু

কিছুতেই আসা হয়ে উঠছিল না। সেই এলাম, কিন্তু যার জন্য এলাম...। চুপ করে গেল আকাশ।

সুমন নরম গলায় বলল, আমাদের বিয়ে হয়েছিল রেজিস্ট্রি করে। সেদিন তোমরা বন্ধুরা সবাই সারাদিন ছিলে আমাদের সঙ্গে। রেজিস্ট্রি অফিসে তোমাদের ছেড়ে আমি আর তিথি পাতাঝোরায় ফিরে এসেছিলাম। তিথিকে বলেছিলাম, মানুষ ভাগ্য করে এমন বন্ধু পায়। তিথিও খুব গর্ব করত তোমাদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব নিয়ে।

তুলি বললেন, আসলে কী জানো, আমাদের সামাজিক জীবনে বন্ধুত্বের গুরুত্ব অসীম। বিশেষ করে শৈশবের বন্ধুত্বের প্রভাব সারাজীবন আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। তোমরা প্রত্যেকে ছোটবেলা থেকে তিথির বন্ধু। সব সময় ওর মুখে তোমাদের কথাই লেগে থাকত।

দিয়া সুমনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল, ওর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বও ঈর্ষণীয় ছিল।

সুমন বলল, আমার আর তিথির বন্ধুত্ব তো আর শৈশবের নয়। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব যে কীভাবে জন্মেছিল, কেন টিকে ছিল, আমৃত্যু বেঁচে ছিল— এ আমার কাছে অনেকটা ধাঁধার মতো। প্রেম বা রাজনীতির মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও স্ববিরোধ রয়েছে। কিন্তু বন্ধুত্ব হল স্বচ্ছ। সবচেয়ে গভীর আর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের ভিত্তি হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

তুলি বললেন, একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে বন্ধুত্ব হয় না। তা ছাড়া বন্ধুত্ব পাতানোই বড় কথা নয়, নিজের ভিতরে বন্ধুত্বকে সযত্নে লালন করতে হয়। বন্ধুত্ব চায় অবিমিশ্র মাধুর্য, স্নেহ। নর-নারীর প্রেম, দাম্পত্যের মতো যেখানে দ্বন্দ্ব বা জটিলতা নেই। স্নেহের বন্ধনে যে জড়ায়, সে-ই হয়ে ওঠে সত্যিকারের বন্ধু।

উৎপলেন্দু এবার মুখ খুললেন, টমাস মানের 'টোনিও ক্রোগার' নামে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। সেখানে টোনিও নামে একটা ক্যারেকটার ছিল। তিথির মতোই টোনিও ছিল ছোটবেলা থেকেই নিঃসঙ্গ। কারও সঙ্গে চট করে মিশতে পারত না। তিথি যেমন খেলাধুলো করতে ভালবাসত না, টোনিও-ও তাই। তার প্রিয় বন্ধু ছিল তার স্কুলের এক উজ্জ্বল ছেলে, যার নাম হান্স হানসেন। তাকেই ভালবাসত টোনিও। তাহলে কি সব দিক দিয়ে বিপরীত বলেই টোনিও হান্সকে ভালবেসেছিল?

একটু থামলেন উৎপলেন্দু। এক এক করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখান থেকে একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগে। সেটা হল, তিথিও কি সুমনকে তেমন কোনও কারণে ভালবেসেছিল? তবে কি আমরা কেউ কেউ বন্ধুর মধ্যে এমন কিছু খুঁজি, যা আমার মধ্যে নেই? বন্ধুত্ব কি তাহলে আমাদের নিজের ভিতরের সেই অভাব থেকে মুক্ত করে? তখন বুঝতে পারিনি, এখন মনে হয়, সুমনের এমন কোনও গুণ দেখেই হয়ত মুগ্ধ হয়েছিল তিথি।

খানিকক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙলেন তুলি। বললেন, নারী আর পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক প্রাথমিকভাবে যৌবন আকর্ষণ থেকেই শুরু হয়। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। একমাত্র যৌবন আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করেই তারা একদিন বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

সুমনের মুখটা আলো-আলো হয়ে গেল। বলল, আমি আর তিথি শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকা নই, আমরা বন্ধুও ছিলাম। আমরা নিজেদের ভিতরে পরিচর্যা করেছি বন্ধুত্বের। শ্রদ্ধা করেছি পরস্পরকে। তিথি একটা কথা খুব বলত। একজন অন্যজনের চোখে শ্রদ্ধার জায়গা থেকে সরে গেলে বন্ধুত্বেরও মৃত্যু হয়।

উৎপলেন্দু সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন, খুব সত্যি কথা।

কথার মাঝখানে হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার মাধব এসেছেন এদিকে। সুমন শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাধব পঙ্‌ক্তিভোজন করেননি। রজনিগন্ধার একটা মালা নিয়ে এসেছিলেন। তিথির ফোটোতে সেটা পরিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার বিদায় নিচ্ছেন। সুমনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে স্কুলে জয়েন করবে ভেবেছ?

সুমন বলল, এদিকের কাজ শেষ হলে বিকেলের বাসে জলপাইগুড়ি যাব ক'দিনের জন্য। তিথির মা নার্সিং হোমে ভরতি আছেন। উনি একটু সুস্থ হলে পাতাঝোরায় ফিরে এসে তারপর স্কুলে যাব।

মাধব একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, দেখো সুমন, তুমি নিজেও ভাল করেই জানো যে, তিথি সময়ের অনেক আগে এভাবে চলে যাওয়ায় তোমার মধ্যে একটা ট্রমা এসেছে। মৃত্যু হল চিরবিচ্ছেদ। চেষ্টা করলেও প্রিয় মানুষটাকে দেখা যাবে না একবারের জন্যও। যে চলে যায়, তার সবচাইতে কাছের মানুষদের মনের মধ্যে এই ট্রমা আসাটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই ট্রমা থেকে বেরিয়েও আসে মানুষ। বেরিয়ে আসতেই হয়। তোমাকেও বেরিয়ে আসতে হবে।

সুমন বিষণ্ণ হাসল, হ্যাঁ, বেরিয়ে তো আসতেই হবে।

মাধব বললেন, শোক গভীরতম হবার পর থেকেই হিলিং প্রসেস শুরু হয়ে যায় মস্তিষ্কের মধ্যে। তোমার মস্তিষ্কেও সেই শুশ্রূষার পদ্ধতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর মতো অনিবার্য কিছু পৃথিবীতে নেই। তবে এই সত্যিটা প্রিয়জনকে হারিয়ে কেউ তাড়াতাড়ি মানেন, কেউ দেরিতে। তুমি জলপাইগুড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল করেছ। এই সময়টায় একাকী না কাটিয়ে যতটা সম্ভব সেইসব মানুষের সঙ্গে থেকো, যাদের তুমি মন থেকে পছন্দ করো।

সুমন ঘাড় নাড়ল, আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

মাধব সুমনের পিঠে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললেন, আর একটা জিনিস মনে রেখো। এখন তোমার যত ইচ্ছেই করুক, কখনও তিথির ছবি কিংবা ব্যবহার করা জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াঘাঁটা কোরো না। তাহলে এই হিলিং প্রসেসটা পিছিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক রুটিনে ফিরে আসাটা এখন হবে তোমার প্রথম কাজ। কোথাও বেড়াতে যাও, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ভাল সিনেমা-থিয়েটার দেখতে বা গান শুনতে যাও, হালকা বইপত্র পড়ো। মোট কথা, নিজেকে ছড়িয়ে দাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাহলে পরিস্থিতি সামলাতে তোমার কিছুটা সুবিধা হবে।

চেয়ারে বসে বসে মাধব আর সুমনের কথোপকথন শুনছিলেন, মাধব চলে যাবার পর তাঁর গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ উদাসী চোখে তাকিয়ে থাকলেন উৎপলেন্দু। অন্যের দুঃখে বিচলিত হন এমন মানুষ কমে আসছে এখন। মাধব নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী একজন মানুষ। এমন মানুষ আছে বলেই এত কিছুর পরেও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে পৃথিবীতে।

৩৮

'এদিকে কোকিল ডাকছে— পৌষের মধ্য রাতে;

কোনও একদিন বসন্ত আসবে বলে?

কোনও একদিন বসন্ত ছিল, তারই পিপাসিত প্রচার?

তুমি স্থবির কোকিল নও? কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি, তারা কিশোর নয়।

কিশোরী নয় আর;

কোকিলের গান ব্যবহৃত হয়ে গেছে।'

জীবনানন্দর কবিতার পঙ্‌ক্তি যেন ভাসছে কানের কাছে। পাশ ফিরে শুলেন মিমি। হাতে লেগেছে, কাতরে উঠলেন ব্যথায়। ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড নিতে নিতে ফুলে গিয়েছে দু'হাত। এখন তিনি অনেকটা ভাল, বিপন্মুক্ত। তবে অক্সিজেন-স্যালাইনের পাট চুকলেও কবজিতে এখনও চ্যানেল করা আছে। দিনে দু'-তিনটে করে ইঞ্জেকশন এখনও নার্স এসে দিয়ে যায় নিয়ম করে। আরও কয়েকটা দিন থাকতে হবে এখানে।

একটা শ্বাস ছাড়লেন মিমি। নার্সিং হোমে থেকে থেকে শুধু মনে হয়, শরীরে যেন কবেকার শ্যাওলা জমেছে। বড় ক্লান্ত লাগে। ডাক্তারবাবু বলছেন, পেশেন্ট সুস্থ হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু মিমি নিজেই শুধু জানেন, তাঁর

নার্সিং হোমে চোখের সামনে অবিরত মৃত্যুকে দেখেন। যতবার দেখেন, আত্মজার কথা মনে পড়ে মিমির। তিথি যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে তাহলে যাবার সময় কি সুমনকে কিছু বলে গিয়েছিল? তাঁর কথা কিছু বলেছিল? চোখের কোণে জল চলকে আসে।

শরীরের অসুখ সারলেও মনের অসুখ ক্রমশ বাড়ছে।

নার্সিং হোমে মিমিকে যিনি দেখছেন, সেই ডক্টর সেনগুপ্ত মানুষটা ভাল। ভদ্রলোক দীপকের বন্ধুস্থানীয়। মিমিকে প্রথম থেকেই 'দিদি' বলে সম্বোধন করছেন, ব্যস্ততার মধ্যেও দু'-চার মিনিট গল্প করছেন। কাল সকালে ডক্টর সেনগুপ্ত ক্যাজুয়াল গলায় জানতে চেয়েছিলেন, সেদিন ঠিক কী হয়েছিল মিমির?

মিমি একটুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। নিজেকে সংহত করে ফিরে গিয়েছিলেন সেই কালো মোষের পিঠের মতো সকালটায়, যখন উৎপলেন্দু অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, ঠিক যখন সুমনের ফোনটা এল। ফোন হাতে নিয়ে বিহ্বল উৎপলেন্দুর মুখে 'তিথি আর নেই'— এই তিনটে শব্দ শুনেছিলেন তিনি। তারপর কী হয়েছিল তিনি জানেন না।

ডক্টর সেনগুপ্ত বুঝিয়ে বলেছিলেন ব্যাপারটা। হঠাৎ শক পেয়ে মিমির হৃদ্‌যন্ত্রের গতি বেড়ে গিয়েছিল। তখন হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনির দেওয়ালে জমে থাকা কোলেস্টেরলের স্তর মুহূর্তে ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাকে ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে 'প্লাক র‍্যাপচার'। মানুষের শরীরে দু'রকম নার্ভ থাকে। সিমপ্যাথেটিক নার্ভ আর প্যারা-সিমপ্যাথেটিক নার্ভ। দুঃখের খবরে প্যারা-সিমপ্যাথেটিক নার্ভ বেশি উত্তেজিত হলে ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে। তখন ব্ল্যাক আউট হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে কেউ। অপ্রত্যাশিত কোনও শোকসংবাদ শুনে কারও কারও আবার সিমপ্যাথেটিক নার্ভ বেশি উত্তেজিত হয়ে হার্টের গতি আর ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়। তখনই হয় হার্ট অ্যাটাকের মতো বিপদ। সারা পৃথিবীতেই সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। ডক্টর সেনগুপ্ত স্মিত মুখে বলেছিলেন, মিমির ভাগ্য ভাল যে তাঁকে ঠিক সময়ে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে।

যে আর ফিরবে না, তাকে যেতে দাও। কথাটা বলা যত সহজ, ততই কঠিন। একদিন যেতেই হবে, সবাই জানে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জীবনমশায় মতির মাকে দেখে ওষুধ দিতে রাজি হননি। বলেছিলেন, 'দুঃখ কীসের গো, নাতিপুতি ছেলে বউ রেখে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে।' নিজের জীবনান্তে সেই বৃদ্ধ কবিরাজ ঘুমের ওষুধ খাননি, মৃত্যুর রূপ, স্বর, গন্ধ অনুভব করতে চেয়েছেন।

সেই কবে কলেজে পড়ার সময় মিমি পড়েছিলেন 'আরোগ্য নিকেতন'। এখনও মনে আছে সেই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রের কথা। এখন নার্সিং হোমে অন্তরিন থাকতে থাকতে জীবনমশায়ের মতো ইচ্ছে করে মৃত্যুকে আবাহন করে নিতে।

মিমি প্রস্তুত সব ছেড়ে চলে যাবার জন্য। এগিয়ে গিয়ে মাননীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা করার মতো করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য তৈরি তিনি। একটা সময় মহাভারত উলটে দেখার নেশা ছিল। সেখানে মহাপ্রস্থানে যাওয়া মনস্থির করে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কী বলেছিলেন, সেটা এখনও ভোলেননি। অগ্রজ পাণ্ডব বলেছিলেন, 'কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দুষ্টুর্মহসি'। অর্থাৎ কালের কবলে আমিও পড়ব, তুমি কর্তব্য স্থির করো। মহাভারতে মৃত্যুর জন্য বসে বসে অপেক্ষা না করে মৃত্যুর খোঁজে বেরিয়েছিলেন মহাকাব্যের নায়করা।

আইসিইউ-তে থাকার সময় মিমি লক্ষ করতেন তাঁর পাশের বেডের রুগিদের। বহু টিউবে আকীর্ণ দেহ, উঠছে-নামছে ভেন্টিলেটরের ব্যাগ, নানা মনিটরে প্রত্যঙ্গের ছন্দরেখা। নিরাময়ের অযোগ্য অসুখে ভুগছেন অনেকে। ভাড়া করা আইসিইউ, কৃত্রিম হাওয়া, ফ্লুরোসেন্ট আলোয় কাটছে তাঁদের শেষ সময়টুকু। এক-এক করে প্রত্যেকটি অঙ্গ কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে। চেতনা আচ্ছন্ন হচ্ছে ক্রমশ। 'তাহলে চলি', 'ক্ষমা কোরো' কিংবা 'ভালবাসি' বলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না কেউ। কিন্তু এভাবে মরে যাওয়া কি একটা অপূর্ণতা নয়?

নার্সিং হোমে চোখের সামনে অবিরত মৃত্যুকে দেখেন। যতবার দেখেন, আত্মজার কথা মনে পড়ে মিমির। তিথি যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে তাহলে যাবার সময় কি সুমনকে কিছু বলে গিয়েছিল? তাঁর কথা কিছু বলেছিল? চোখের কোণে জল চলকে আসে। তাঁর বাইরেটাই তো বরাবর দেখে গেল তিথি, তাঁর ভেতরটা জানল না কখনও।

মিমির পাশের বেডে এক পেশেন্ট ভরতি ছিলেন দু'মাস ধরে। বয়স পঞ্চাশ ছোঁয়নি। অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস। পরপর যাওয়ার পর চারবার অপারেশন করে প্যানক্রিয়াসের আরও, আরও একটু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। শেষ দশ-বারো দিন আশা নেই জেনেও ডায়ালিসিস, ভেন্টিলেশন চলেছে। তারপর গতকাল এসেছে মৃত্যু। রোগীর জীবনের শেষ দিনগুলোর দোলাচল, আর তার সামনে দাঁড়ানো ডাক্তারদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে দেখে নশ্বরতা সম্বন্ধে নতুন করে জেনেছেন মিমি।

তাঁর জন্য খুব করছেন দীপক আর তুলি। দিন নেই, রাত নেই নার্সিং হোমে পড়ে রয়েছেন। ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে যে সময়টা, তার বেশির ভাগ সময় নার্সিং হোমের চৌহদ্দিতেই থাকেন দু'জনে। ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা, ওষুধপত্র বাইরে থেকে আনা, রোগীর পথ্য বাড়ি থেকে নিয়ে আসা— সব। মানুষের ভালবাসা পাওয়ার মধ্যে যে আশ্চর্য একটা আনন্দ আছে, তার তুলনা নেই।

উৎপলেন্দু সেই যে পাতাঝোরা চলে গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। আজ ভোরবেলা তিথির বন্ধুদের সঙ্গে তুলিও গিয়েছেন সেখানে। দীপক কিছু বলেননি মিমিকে। কিন্তু গর্ভধারিণীর নিজস্ব ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে মিমি বুঝতে পেরেছেন, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে পাতাঝোরায়।

সকালে রাউন্ডের পর দীপকের সঙ্গে কেবিনের বাইরে ডক্টর সেনগুপ্তর কথা হচ্ছিল নিচু গলায়, আবছা আবছা শুনতে পাচ্ছিলেন মিমি। তিথির ব্যাপারে কিছু কথা হচ্ছিল বুঝতে পারছিলেন। ডক্টর সেনগুপ্ত বলছিলেন, ব্লাড প্রেশার কম হলে ভয় তেমন ছিল না, কিন্তু মিমির রক্তচাপ বেশি, তাই অপ্রত্যাশিত কোনও শকের অভিঘাত থেকে বিপদের সম্ভাবনাও বেশি।

দীপক ব্যাকুল গলায় বলছিলেন, আগে থেকে প্রতিষেধক নিয়ে অবশ্যম্ভাবী সেই বিপদ এড়ানো যায় কি না। ডক্টর সেনগুপ্ত বলছিলেন, না, যায় না। আসলে পুরোটাই নির্ভর করে পেশেন্টের স্নায়বিক আর মানসিক জোরের উপর। হঠাৎ শোকের খবর পেয়ে সব সময় যে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হবে বা রুগি অজ্ঞান হয়ে যাবে এমনটা না-ও হতে পারে। অনেক সময় পেশেন্টের বুকে ব্যথা, হাত-পা ঝিনঝিন, মাথা ঘোরা বা সাময়িক স্মৃতিভ্রংশের মতো 'সিমটোম্যাটিক ওভারড্রাইভ'-এর সমস্যাও দেখা যায়। শুরু হতে পারে প্রবল শ্বাসকষ্ট। যাকে বলে 'সাইকোজেনিক হাইপার ভেন্টিলেশন'। তাই হঠাৎ করে কোনও খারাপ খবর মিমিকে না জানাতে বারণ করেছিলেন ডাক্তারবাবু। বলছিলেন, জানালেও তা সইয়ে নিয়ে বলতে।

নার্সিং হোমের কেবিনের এয়ারকন্ডিশনার থেকে হিম হিম হাওয়া বেরোয়। মিমির ঘোরের মধ্যে মনে হয়, বসন্তের হিম জড়ানো

হাওয়া তাঁর হারানো ঘরের স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে আসে। হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা দুঃখ ডুবিয়ে দেয় অদ্ভুত এক বিষাদে। নশ্বরতার এক কুয়াশাচ্ছন্ন বোধ টের পান মিমি। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজলেই শিমুল-পলাশের রক্তঝরনা দেখেন। শুনতে পান কোকিলের অশ্রুত কুহু ডাক। মনে হয় গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে কী যেন খুঁজে চলেছে একটা কোকিল। যেন বলছে, কোথায়? কোথায়?

মিমির মনের মেঘলা আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়ায় বিবর্ণ বাদামি পাতার দল। মনে হয় বারবার, এখানে তো আমার ঘর নয়। কোথা থেকে এসেছিলাম আমি? যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই তো ফিরে যেতে হবে একদিন।

তিথি কি সেখানে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য? কে জানে।

৩৯

'লাজিম থা কে দেখো মেরা রস্তা
কোই দিন অওর তনহা গয়ে কিঁউ?
অব রহো তনহা কোই দিন অওর।'

তিথির বন্ধুদের সঙ্গে এতক্ষণ বসে ছিলেন। এবার উঠেছেন উৎপলেন্দু। সুমনদের বাড়ির পেছনদিকে বেশ খানিকটা জায়গা। সেদিকটায় উৎপলেন্দু হাঁটছেন আপন মনে আর মনে মনে ভেবে নিচ্ছেন কল্পদৃশ্যটি। বাইরে পুরানো দিল্লির শোরগোল আর আলোর রোশনাই, ভিতরে চরম নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজের ছোট হাভেলির দাওয়ায় বসে কুপি জ্বালিয়ে হয়ত এই গজলের প্রথম শেরটি লিখেছিলেন তিনি। 'তোমার উচিত ছিল আরও কিছুদিন আমার জন্য অপেক্ষা করা। একা চলে গেলে কেন? এখন থাকো আরও কিছুদিন একা।'

মৃত্যু তাঁকে একা করে দিয়েছে বারবার। কিন্তু এর আগে প্রত্যেকবার কবরখানা থেকে ফেরার পর তবুও মনের মধ্যে একটু হলেও উমিদ-এর রোশনি ছিল। কিন্তু এবার সব আশা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। কিন্তু তবুও সেই আঁধারের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন না বয়স্ক এই শায়র। তাঁকে ধারাবাহিক আক্রমণ করছে মৃত্যু, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে একদম দেওয়ালের দিকে। তবুও হার মানছেন না, মৃত্যুশোকের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে লিখছেন আরও একটি গজল। তাঁর নাম অসদউল্লা বেগ। সারা দুনিয়া যাঁকে চেনে মির্জা গালিব নামে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে জীবন আর মৃত্যুর ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে শোকের নিস্তরঙ্গ এক নদী। তাকে এড়িয়ে এগনোর পথ নেই। উৎপলেন্দু তিথির ফুল দিয়ে সাজানো ছবিটা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন।

শোক এসেছে, কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না এখন। তিথির শারীরিক উপস্থিতির বাইরেও তিথিকে অনুভব করার মতো মানসিক পরিণতি তিনি অর্জন করেছেন এতদিনে। কিন্তু সুমন তো সেদিনের ছেলে। সে কি পারবে শোকের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে সবচাইতে কাছের মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে?

সুমন আজ ব্যস্ত। নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করছিল হাসিমুখে, মাঝে মাঝে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল আকাশদের দলটার সঙ্গে বসে। এবার লক্ষ করেছে শ্বশুরমশাইকে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে চলে এসেছে উৎপলেন্দুর কাছে। বলল, আদা দিয়ে চা করেছে মা। একটু চা খান, ভাল লাগবে।

উৎপলেন্দু সুমনের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিলেন। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে গল্প করার ঢঙে বললেন, মির্জা গালিবের নাম শুনেছ?

সুমন ঘাড় নাড়ল। শুনেছে।

উৎপলেন্দু বললেন, মির্জা আর উমরাও বেগমের বহু দিনের দাম্পত্যে বেশ কয়েকবার সন্তানসুখ লাভ করেছেন তাঁরা দু'জনে। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। কোনও ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে হয়েছে কয়েকদিন। কিন্তু কিছুতেই 'আব্বু' ডাক শোনার সৌভাগ্য হয়নি মির্জার। একের পর এক মৃত্যুশোক উমরাওকে পরিণত করেছে পাথরে। শেষে ভাইপো আরিফকে দত্তক নিলেন মির্জা। সেই আরিফও মারা গেল মাত্র যোলো বছর বয়সে।

সুমন বলল, তা-ই?

উৎপলেন্দু সুমনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তখন শোকে উন্মাদ না হয়ে গিয়ে বা আত্মহত্যা না করে মানুষটি কী করতে শুরু করলেন জানো? তাঁর ভেতরের সমস্ত উথাল ঢেউকে নিয়ে এলেন তাঁর কলমে। তৈরি হল বাবা-ছেলের এক দৈনন্দিন কথোপকথন। দেরি করে বাড়ি ফিরলে বাবা যেমন ছেলেকে বকুনি দেন, ঠিক তেমন করে আদরের বকুনি দিচ্ছেন বাবা। দেরি করে ফেরার জন্য নয়। তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য। এখানেই মৃত্যুশোককে হেলায় হারিয়ে দিচ্ছেন মির্জা।

সুমন একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, মির্জার সম্পর্কে আমি জানতাম না। তবে আমাদের হাতের কাছে তো রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। তাঁর জীবনটাও তো তা-ই।

উৎপলেন্দু বললেন, ঠিক বলেছ। একের পর এক ব্যক্তিগত শোকের পাহাড়প্রমাণ চাপ ঠেলে সরিয়ে বৃহত্তর বোধের কাছে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার যে শিক্ষা, তা শিখতে হয় এই মানুষটির কাছ থেকে। মৃত্যু এক পোষ-না-মানা ঝড়ের মতো তছনছ করে দিয়েছে তাঁকে, তবুও তিনি প্রত্যেকটি মৃত্যুর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন শোককে। সেই শোক থেকে জন্মেছে

লাল চন্দন নীল ছবি

এক কথায় ডুয়ার্সের প্রথম মেগা সিরিয়াল। এই ধারাবাহিকের ডুয়ার্স রোমান্টিক নয়, বরং কষ্টিপাথরের মতো অন্ধকার। এখানে উচ্চবিত্ত পরিবারের তরুণী স্বেচ্ছায় বেছে নেয় শরীর বিক্রির পেশা, ইচ্ছে অনিচ্ছায় ভিন রাজ্যে যৌনদাসী হয়ে চলে যায় অসংখ্য বালিকা-কিশোরী-তরুণী। সুসজ্জিত টুরিস্ট স্পটের পাশেই নিঃশব্দে 'ডিল' হয় হোমমেড পর্ন ভিডিওর। আর, রহস্যময় এক অপরাধচক্র দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সুপরিকল্পিত অপরাধ চক্র। ভায়া কলকাতা হয়ে নির্দেশ আসে এক ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছ থেকে। তবুও কাশিয়াগুড়ি গ্রামের নিঁখোজ যুবককে খুঁজতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী টের পেয়ে যান অতি ক্ষীণ এক সূত্র। দেখা যায় অপরাধের অন্ধকারে নিমগ্ন এক ভিন্ন ডুয়ার্সের চলচ্ছবি। এ এক থ্রিলারে ছোঁয়া লাগা অভিনব মেগা সিরিয়াল, ১ জানুয়ারি সংখ্যা থেকে। কোনও পর্বই মিস করা যাবে না।

জানুয়ারি ২০১৬ থেকে 'এখন ডুয়ার্স' পাক্ষিক প্রকাশিত হবে মাসের ১ ও ১৫ তারিখ।

তাঁর নতুন সৃজন।

সুমন বলল, রবীন্দ্রনাথ বা মির্জা সৃষ্টিশীল মানুষ, ওঁদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে গান নেই, লেখা নেই, বৃহত্তর সমাজের কাছে কোনও দায়ও নেই, আমরা কী করে শোককে ভুলে থাকব? কোথা থেকে পাব বেঁচে থাকার জোর?

উৎপলেন্দু মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললেন, আমরা বেঁচে থাকব তিথির কথা ভেবেই। মসুর ডালের উপরের অংশে যেমন ভেসে ওঠে জল, ঠিক তেমনি শোকের অভিঘাত থিতিয়ে এলে শোকের উপর তেমন করে ভেসে ওঠে স্মৃতি। আর মৃত্যুশোক তখন সমুদ্রের নিচের প্রবালদ্বীপ হয়ে থেকে যায়। শোকের অভিঘাত থিতিয়ে এলে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভাল লাগার, ভালবাসার, ভাল থাকার স্মৃতি হয়ে ওঠে সেই প্রবালদ্বীপের চুড়ো। আমরা যারা তিথির অদৃশ্য মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আছি, তারা এক-একজন যেন দিক ভুলে যাওয়া এক-একটা জাহাজ। দূর থেকে ওই প্রবালদ্বীপের চুড়ো দেখেই এর পর থেকে দিন কাটবে আমাদের।

সুমন বলল, ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে তার তীব্রতা ততটা টের পাওয়া যায় না। আজ থেকে কয়েক বছর পর যখন এই সময়টার দিকে ফিরে তাকাব, তখন বুঝতে পারব কী করে পেরিয়ে এলাম এতখানি অসহনীয় পথ।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এসে পড়েছেন বাড়ির উঠোনে, যেখানে দিয়া-অলিভিয়ারা বসে আছে গোল হয়ে। উৎপলেন্দুকে দেখতে পেয়ে আকাশ আলগোছে বাঁ হাতের কবজির দিকে তাকিয়ে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেজো গলায় বলল, কাকু, বিকেল হয়ে এসেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নাও। সুমনদা, তুমিও রেডি হয়ে নাও।

তুলি বললেন, এখান থেকে জলপাইগুড়ি যেতে ঘণ্টা চারেক লাগবে। রাস্তার হাল কোনও কোনও জায়গায় বেশ খারাপ। আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বৃষ্টিটা ধরেছে ঠিকই, কিন্তু যে কোনও সময় আবার ঢালবে। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে গেলে গাড়ি চালাতেও ড্রাইভারের অসুবিধা হবে।

উৎপলেন্দু ঘাড় নেড়ে বললেন, তোমরা বেরিয়ে যাও। আমি আর সুমন বাসে চেপে চলে যাব। কোনও অসুবিধা হবে না। জলপাইগুড়ি যাবার শেষ বাস ছাড়তে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে।

নীল উৎপলেন্দুকে আশ্বস্ত করে বলল, তুমি হেজিটেট কোরো না কাকু। যে গাড়ি নিয়ে আমরা পাতাঝোরায় এসেছি, তাতে প্রচুর স্পেস। তোমরা দু'জনে বসার পরেও অনেক জায়গা থাকবে। একটুও অসুবিধা হবে না। আমরা প্রত্যেকে আরামসে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারব।

উৎপলেন্দু সুমনের মুখের দিকে সম্মতির জন্য তাকালেন। জামাই আর শ্বশুরের চোখে চোখে নীরব ইশারা হল বুঝি। উৎপলেন্দু স্মিত মুখে বললেন, বেশ। তোমরা যখন এত করে বলছ... তবে তা-ই হোক।

৪০

আকাশ বলল, পাতাঝোরা গ্রামে এই প্রথম এলাম। এর আগে আমাদের রাজ্যের গ্রাম নিয়ে আমার তেমন কোনও ধারণা ছিল না। এসে দেখলাম হা-গরিব দশা এই গ্রামে, তুমুল অভাব-অনটন, কিন্তু এদিকের মানুষগুলো বড্ড ভাল।

নীল পাশ থেকে বলল, সমাজবিজ্ঞান নিয়ে যারা একটু-আধটু চর্চা করে, তারা জানে, পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আফ্রিকার ছাব্বিশটি দরিদ্রতম দেশের গরিব মানুষের চাইতেও বেশি। গরিব পরিবারগুলির আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সেই সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসা কিংবা বাসস্থানের মতো জরুরি জিনিসগুলো থেকেও এই মানুষগুলো বঞ্চিত। তার ফলে যেটা স্বাভাবিক ছিল, দারিদ্র তাদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলতে পারত। মূল্যবোধ কেড়ে নিতে পারত। সেটা কিন্তু পাতাঝোরায় হয়নি।

অলিভিয়া বলল, এদের বেশির ভাগেরই স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, উপার্জন নেই। ছোট থেকেই এদের দিন কেটেছে অর্ধাহারে। কাজেই এই এতগুলো 'নেই' থেকেই জন্ম নিতে পারত জ্বলন্ত আক্রোশ। পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারত গোটা গ্রাম। তছনছ করে দিতে পারত সবকিছু। কিন্তু এই গ্রামের মানুষগুলো নরমসরম বলেই সেটা হয়নি। আসলে হয়ত ডুয়ার্সের প্রকৃতি এত কোমল বলেই এদিকের মানুষগুলোর মনটাও নরম। শত বঞ্চনাতেও মুখে রা কাড়ে না কেউ।

দিয়া বলল, এই লোকগুলোর পাশাপাশি শহরের দু'নম্বরি টাকায় ফুলেফেঁপে ওঠা উটকো বড়লোকদের কথাই ধর। তাদের দু'-আড়াই হাজার স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটের মেঝেতে ইতালিয়ান মার্বেল। দেওয়ালে দামি ইমালশন। স্লাইডিং কাচের জানলা-দরজা। মেঝেতে দামি কার্পেট। স্প্লিট এসি। দামি গাড়ি। পাতাঝোরার এই গরিবস্য গরিব মানুষগুলো নাগরিক বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রার কথা জানবেও না কোনও দিন।

এসইউভি গাড়ির সামনের সিটে উৎপলেন্দু আর সুমন পাশাপাশি বসা। মাঝের সিটে তুলি, দিয়া, অলিভিয়া। পিছনের সিটে আকাশ আর নীল। গাড়ি চলছে আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে। আকাশ মেঘলা। দু'-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও কোথাও। কোনওখানে আবার বৃষ্টি নেই। দূরমনস্ক চোখে সকলেই তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

উৎপলেন্দুও পাতাঝোরার সবুজ প্রকৃতি দেখছিলেন। আবার দেখছিলেনও না সেভাবে। হাতে ধরা রং জ্বলে যাওয়া একটা গোলাপি কাপড়ের টুকরো। সুমন কৌতূহলী স্বরে বলল, এই কাপড়ের টুকরো আপনি পেলেন কোথায়?

উৎপলেন্দু সুমনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের বাড়ির পেছনদিকে একটা বাঁশঝোপ আছে দেখলাম। আজ সকালে সময় কাটছিল না, একবার ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছিলাম ওদিকটায়। বাঁশ গাছের মধ্যে দেখি বেশ কিছু রঙিন কাপড় টাঙানো রয়েছে। একটা কাপড় হাতে নিয়ে দেখি কালো কালি দিয়ে কী সব লেখা। রোদে, জলে লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লেখার ছাঁদ দেখে মনে হয় এগুলো তিথির হাতের লেখা। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি একটা টুকরো।

উৎপলেন্দুর হাতে ধরা গোলাপি কাপড়টার দিকে তাকিয়ে আছে সুমন। ভেতরটা হু হু করছে। পুরানো স্মৃতির ঘ্রাণ আসছে নাকে। কাপড়টা হাতে নিয়ে ম্লান মুখে সুমন বলল, সাতই জুলাই ছিল তানাবাতা উৎসব।

উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, কী উৎসব?

সুমন বলল, সপ্তম মাসের সপ্তম তারিখে জাপানিরা পালন করে এই উৎসব। সেদিন ছেলেমানুষের মতো বেশ কিছু রঙিন কাপড়ে মনস্কামনা লিখে রেখেছিল তিথি। ওর কথামতো এগুলো বাড়ির পেছনদিকের উঠোনে দু'-চারটে বাঁশ গাছে টাঙিয়ে এসেছিলাম আমি।

উৎপলেন্দু বললেন, তিথির অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেয়াল ছিল। কিন্তু এই কাপড়গুলোতে মনস্কামনা লিখে বাঁশ গাছে টাঙালে কী হয়?

সুমন বলল, বাঁশ গাছগুলোকে বলে 'উইশিং ট্রি'। যাকে বলা যেতে পারে ইচ্ছের গাছ। সেখানে এই বিশেষ দিনে কিছু লিখে টাঙিয়ে রাখতে হয়। পরিবারের সদস্যদের অসুখ আর দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে এই পেপার কিমোনো টাঙায় জাপানিরা। ওরা বিশ্বাস করে, এই বিশেষ দিনে উইশিং ট্রি-তে কিছু লিখে টাঙিয়ে রাখলে তা ফলবে। মঙ্গল হবে বাড়ির।

উৎপলেন্দু বিদ্রুপ করে বললেন, হ্যাঁ, তা বাড়ির মঙ্গলই হয়েছে বটে!

সুমন বলল, কী জানি। এমন করেও তো ভাবা যেতে পারে যে, নিজের জন্য কিছু চায়নি তিথি। আমাদের মঙ্গল চেয়েছিল। সেটাই হয়েছে। আমাদের হয়ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

উৎপলেন্দু তির্যক স্বরে বললেন, সেটা হয়ত করেছে। কিন্তু নিজের বিপদটা তো

পশ্চিমবঙ্গের গর্ব ও ঐতিহ্য

- গরুমারা জাতীয় উদ্যান
- নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান
- সিংহলিলা জাতীয় উদ্যান
- জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান
- চাপড়ামারী অভয়ারণ্য
- সিনচল অভয়ারণ্য
- মহানন্দা অভয়ারণ্য

এই ঐতিহ্য সমূহ আমাদের আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতি আশা করি।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মানবজাতির স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে বন ও বন্যপ্রাণীকে সার্বিকভাবে রক্ষার দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার। এ দায়িত্ব পালনে আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ও তৎপর হই।

বনপাল
বন্যপ্রাণ উত্তর মন্ডল, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

জনস্বার্থে প্রচারিত

গাড়ির সিটে দুই অসমবয়সি পুরুষ পাশাপাশি বসা। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়িতে ঝাঁকি হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই সুমনের হাঁটুতে লেগে যাচ্ছে উৎপলেন্দুর হাঁটু।

রুখতে পারল না তিথি। চলে গেল আমাদের সবাইকে ছেড়ে। বুঝলে সুমন, জেরুজালেম শহরে একটা দেওয়াল আছে। ইংরেজিতে তাকে বলে ওয়েলিং ওয়াল। বাংলায় বলা যেতে পারে বিলাপ-দেওয়াল। অর্ধেক পৃথিবী থেকে লোক সেখানে যায় কাঁদতে। ওই দেওয়াল ছুঁয়ে, মাথা ঠেকিয়ে, লুটিয়ে পড়ে, হাঁটু গেড়ে বসে জপ করে নিজেকে খুঁজে পেতে যায় মানুষ।

সুমন বলল, আপনি কি ইহুদিদের কথা বলছেন?

উৎপলেন্দু মাথা নাড়লেন, যাঁরা জেরুজালেমে যান, তাঁদের সবাই যে ইহুদি তা নয়। সব দেশের লোকই আছে ওখানে। আমার এক বন্ধু গিয়েছিল এবার। ওর মুখে শুনেছি, পাথরের যদি গলার ক্ষমতা থাকত তাহলে দু'হাজার বছরে হলদেটে চুনাপাথরের দেওয়াল গলতে গলতে একেবারে জেলি হয়ে যেত।

তুলি পাশ থেকে জানতে চাইলেন, সত্যিই কি ওই সড়ক ধরে হেঁটে গিয়েছিলেন ক্রুশবাহী যিশু?

উৎপলেন্দু মাথা নাড়লেন, এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত। যিশু কোথায় জন্মেছিলেন, বড় হয়েছিলেন, তা নিয়ে বাইবেলের গল্পকে উড়িয়ে দেন গবেষকরা। কিন্তু তাঁকে যে জেরুজালেমেই মারা হয়েছিল, সেটা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

তুলি সায় দিলেন, হ্যাঁ, সেটা জানি। শুনেছি জেরুজালেমে প্রায় চার হাজার ফুট দেওয়ালের মাত্র ষোলোশো ফুট দাঁড়িয়ে আছে আজও। বাকিটা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল রোমানরা।

উৎপলেন্দু বললেন, আজ পশ্চিমের ওই দেওয়ালটুকু ছুঁয়ে ইহুদিরা ভাবে, একদিন এই দেওয়াল ছিল তাদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। হেরোডের মন্দির। আর হ্যাঁ, যে পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন যিশু, তার নাম ল্যাটিনে 'ভায়া ডলরোসা'। বাংলা করলে বলা যায়—দুঃখসরণি।

অলিভিয়া শুনছিল উৎপলেন্দুর কথা। বলল, ভাবতেই আশ্চর্য লাগে, কোনও এক ঝাপসা সময়ে কী যে অমূল্য আমানত ছিল ওখানে, যার খোঁজে শিকড়ের টানে ছুটে ছুটে আসে মানুষ, শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদতে!

উৎপলেন্দু বললেন, শুধু কাঁদেই যে তা কিন্তু নয়। জামার ভাঁজ থেকে কি ব্যাগের পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে গুঁজে দেয় পাথরের খাঁজে। মনের ইচ্ছের কথা লেখা থাকে সেই কাগজে। বিশ্বাসী মানুষ যিশুর কাছে প্রার্থনা লেখে ওই কাগজে। তিথি যেমন ওই গোলাপি কাপড়গুলোতে লিখে রেখেছিল ওর প্রার্থনা।

সুমন ঠোঁট টিপে থাকল একটু। গলাটা খাদে নিয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, মনের ভার হালকা করার জন্য আলাদা করে জেরুজালেম যারা যায়, তারা যায়। আমার কথা আলাদা। আমার প্রত্যেকটা আগামী দিনই আমার কাছে জেরুজালেম।

উৎপলেন্দু সুমনের পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমার বয়স কম। এখন তোমার সামনে লম্বা একটা জীবন পড়ে আছে। তিথির স্মৃতি আঁকড়ে শুধু শুধু বোকার মতো পড়ে থেকো না। লক্ষ্মীমন্ত দেখে একটা বউ এনো বাড়িতে।

সুমন মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, তিথি মাঝে মাঝে মজা করে কী বলত জানেন? বলত, আমি মরে গেলে আর একটা বিয়ে যদি তুমি করেছ, আমি ভূত হয়ে তোমাদের দু'জনকে ঘাড় মটকে দেব! হাসির কথায় হাসা উচিত ছিল। সুমন কেঁদে ফেলেছে হাউ হাউ করে।

উৎপলেন্দু অনেক কষ্টে নিজের কেঁপে ওঠা শরীরটা সামলে বললেন, সুমন, তুমি এখন থেকেই ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করে দাও। এবার আরও বেশি জমিতে চাষ করো। তেমন বুঝলে তোমার মায়ের সঙ্গে আর নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে নাও। তোমাকে ইন্টারেস্ট-ফ্রি লোন স্যাংশন করিয়ে দেব আমি। না না, তুমি আপত্তি কোরো না। আমি আনডিউ কিছু ফেবার করছি না তোমাকে। আমার সন ইন ল-র জন্য সেটুকু করতেই পারি আমি। কোম্পানি আমাকে সে লিবার্টি দিয়েছে।

সুমন আলতো হাসল। মুখে কিছু বলল না।

গাড়ির সিটে দুই অসমবয়সি পুরুষ পাশাপাশি বসা। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়িতে ঝাঁকি হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই সুমনের হাঁটুতে লেগে যাচ্ছে উৎপলেন্দুর হাঁটু। পায়ে পা ঠেকে গেলে প্রণাম করার রীতি। সুমন প্রথমদিকে দু'-চারবার কপালে হাত ঠেকিয়েছিল। এখন আর ছোঁয়াচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে গভীর কোনও ভাবনায় ডুবে গিয়েছে সুমন।

উৎপলেন্দু আনমনা, উদাসী। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কতদিন বাদে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছি! গাড়িটা একটু দাঁড় করাবে ভাই? একটুখানি হাঁটতাম। আবার কবে সুযোগ হয়-না হয়।

ড্রাইভার ছেলেটি গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন উৎপলেন্দু। সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে আকাশ, নীল, দিয়া, অলিভিয়া, তুলি আর সুমন। পাশাপাশি হাঁটছে সকলে। যত দূর চোখ যায় সামনে ধানখেত। ধানখেতের মাঝখান দিয়ে সরু এবড়োখেবড়ো পথ দিয়ে দিনের শেষে চাষিরা বাড়ি ফিরে আসছে।

উৎপলেন্দু একটা শ্বাস ফেলে বললেন, আমার কেমন আক্ষেপ হচ্ছে, এত সুন্দর করে সেজেছে প্রকৃতি, যেন আনন্দের সৃষ্টিছাড়া বান ডেকেছে। অথচ এমন আনন্দের দিনে তিথিটাই শুধু নেই।

সুমন উৎপলেন্দুর পাশাপাশি হাঁটছে। ঘোর লাগা গলায় বলল, কে বলেছে নেই? আমি জানি তিথি আছে। ট্রেন চলে যাবার বহুক্ষণ পরেও রেল লাইনে যেমন ট্রেনের শব্দ লেগে থাকে, তেমন করে তিথি আছে। আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে আমার জীবনে।

উৎপলেন্দু ফিসফিস করে বললেন, আমাদের জীবনে।

দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎপলেন্দু বললেন, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, তিথি এখানেই লুকিয়ে আছে কোথাও? অলক্ষ্যে লুকিয়ে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে?

সুমন ছেলেমানুষের মতো করে হেসে বলল, আমি এ কথাটাই ভাবছিলাম। এই আকাশে মেঘের আড়ালে কোথাও... কিংবা এই ধান গাছের আড়ালে কোথাও বুঝি লুকিয়ে আছে তিথি।

বাকিরা এগিয়ে গিয়েছে একটু। সামান্য পেছনে পাশাপাশি পথ হাঁটছেন উৎপলেন্দু আর সুমন। বিকেল একটু একটু করে ঢলছে সন্ধের দিকে। পশ্চিম আকাশে কমলা রঙের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সেই স্বপ্নিল আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে চরাচর জুড়ে। ধানখেতের সবুজের সঙ্গে পড়ন্ত বিকেলের মেহগনি রং মিশে গিয়েছে। যেমন করে পরিপূর্ণতা আর অপ্রাপ্তি অনেকটা পথ হেঁটে এসে এক অমল সন্ধিক্ষণে এসে লগ্ন হয়, ঠিক তেমন করে।

এক আশ্চর্য নারী সহসা হারিয়ে গিয়েছে দু'জন অসমবয়সি পুরুষের জীবন থেকে। এই ধানখেত যেন এই দুই বিষাদগ্রস্ত পুরুষের সমব্যথী। জীবনে ফেলে আসা হীরের কুচির মতো মুহূর্তগুলির কথা ভেবে নিজের বুক চিরেছে এই ধানের খেত।

আদিগন্ত ধানখেত, মাঝে সরু এক চিলতে যাতায়াতের রাস্তা। সেই পথ ধরে নিজের নিজের মতো করে অন্তর্যাত্রা করছে দু'জন পুরুষ। শেষ বিকেলের রজন হলুদ আলোয় স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে এই বসন্তপথ।

(সমাপ্ত)

অঙ্কন: সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্স নিয়ে নাট্যপ্রেমীদের আশাভঙ্গ

জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্সে নাটক করার জন্য স্থানীয় নাট্যদলগুলিকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা পূরণ করার কোনও উদ্যোগ না থাকায় শহরে নাট্যচর্চা গভীর সংকটের মুখোমুখি। রবীন্দ্রভবন সংস্কারের কারণে আগামী মার্চ অবধি বন্ধ। আর্ট কমপ্লেক্স স্থানীয় নাট্য এবং সংস্কৃতি চর্চার জন্য বাম আমলে নির্মিত হয়েছিল। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু চার পাঁচ জায়গা ঘুরে, এমনকি শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছোটাছুটি করে সেই মঞ্চ ব্যবহারের অনুমতি পেতে কালঘাম ছুটে যেত নাট্যদলগুলির। এসজেডি-এর অধীনে থাকা ওই মঞ্চের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছিল এক হাজার টাকা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গৌতম দেব কলকাতার প্রিয়া এন্টারটেইনমেন্ট নামক বেসরকারি সংস্থার হাতে সিনেমা চালানোর জন্য মঞ্চটি তুলে দিতে চাইলে শহরে জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়। ফলে, নাট্যদলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে মন্ত্রীমশাই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মাসে কয়েকদিন নাটকের জন্য মঞ্চটি উক্ত সংস্থা ছেড়ে দেবে, ভাড়া নেবে তিন হাজার টাকা। এই টাকায় আলো আর শব্দের ব্যবস্থা থাকবে। এমনকি প্রিয়া এন্টারটেইনমেন্ট মঞ্চটি রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে আর্ট কমপ্লেক্সে সিনেমা দেখানো শুরু হয়।

কিন্তু দু'বছর পরে দেখা যাচ্ছে প্রিয়া এন্টারটেইনমেন্ট স্রেফ বাণিজ্য করে যাচ্ছে। তিন হাজার টাকা ভাড়া নিলেও আলো আর শব্দের কোনও ব্যবস্থা করছে না। বরং আরও সাত-আট হাজার টাকার বোঝা এসে পড়েছে নাট্যদলগুলির উপর। এছাড়া টয়লেটে জল বন্ধ করে রাখা, বাতানুকূল যন্ত্র থামিয়ে দেওয়ার মতো অনৈতিক কাজও করে চলেছে।

সৃষ্টি মাইমের পরিচালক সব্যসাচী দত্ত জানালেন, 'মঞ্চের অবস্থা খুব খারাপ। প্রিয়া এন্টারটেইনমেন্ট কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। শো-এর দিন দু'টি সিনেমার শো চালিয়ে মঞ্চ ব্যবহার করতে দিচ্ছে সন্ধে ছ'টা নাগাদ। অথচ শো শুরুর দু'ঘণ্টা আগে মঞ্চ ও সাজঘর দরকার পড়ে।' শিলালি নাট্যমের পিনাকী সেনগুপ্ত, রুপায়ণ নাট্য সংস্থার দীপঙ্কর রায়, কলাকুশলীর তমোজিত রায়ও এই বক্তব্য সমর্থন করলেন ক্ষোভের সঙ্গেই।

প্রিয়ার ম্যানেজার ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্রীকে সামনে রেখে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিনেমা চালানোর ব্যবসাই তাঁদের উদ্দেশ্য। ফলে ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে নাট্যমোদীদের মধ্যে। এই শীতের মরশুমে শহরের নাট্যদলগুলির অধিকাংশই নাট্য প্রযোজনা করতে পারবে না, কারণ রবীন্দ্র ভবন বন্ধ, শহরে আর তৃতীয় কোনও মঞ্চ নেই। এই অবস্থায় আগামী দিনে আর্ট কমপ্লেক্স অবরোধ করে সিনেমার টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার মতো চরম আন্দোলনে যাওয়ার ভাবনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ, রাজনীতির ল্যাজ ধরে আর্ট কমপ্লেক্সকে প্রিয়া যেভাবে পুঁজি বাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছে, তা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। কিন্তু নাট্যপ্রেমীরাও হাল ছাড়বে না। ফলে সংঘাত কেবল সময়ের অপেক্ষায়। **(নি.প্র.)**

ডুয়ার্স জুড়ে নাট্যোৎসব

কোচবিহার

২ ডিসেম্বর : যুদ্ধখেলা, প্রযোজনা : আইপিএ
স্থান : রবীন্দ্রভবন

দিনহাটা প্রগতি নাট্য সংস্থার অসম-বাংলা নাট্যমেলা, ২ থেকে ৮ জানুয়ারি ২০১৬
স্থান : নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদন, দিনহাটা

৮ জানুয়ারি : চাঁদের দেশ
প্রযোজনা : স্কেটেড, স্থান : রবীন্দ্রভবন

৯ ও ১০ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় উৎসব। অংশ নেবেন শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা
স্থান : রবীন্দ্রভবন

২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি : ইন্দ্রায়ুধ গোষ্ঠীর নাট্যোৎসব। স্থান : কোচবিহার রবীন্দ্রভবন

১ থেকে ৮ ফ্রেব্রুয়ারি : কম্পাস নাট্যোৎসব ২০১৬, স্থান : রবীন্দ্রভবন

৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি : গিলোটিনের নাট্য উৎসব, স্থান : নজরুল সদন, মাথাভাঙা

১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি : অনুভব নাট্য উৎসব, স্থান : রবীন্দ্রভবন

২৯ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ : বর্ণনার নাট্যোৎসব, স্থান : রবীন্দ্রভবন

১-৬ মার্চ : কালজানি নাট্য উৎসব
স্থান : ম্যাকউইলিয়াম হল, আলিপুরদুয়ার
প্রযোজনা : সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা

২৪-২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ : 'রজত ও আলোয় ছন্দ যতি' আবৃত্তি উৎসব, স্থান : এম জে এন স্টেডিয়াম, কোচবিহার। প্রযোজনা : ছন্দ যতি আবৃত্তি সংস্থা, কোচবিহার

আলিপুরদুয়ার

১৫-২০ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির নাট্যমেলা
স্থান : ম্যাকউইলিয়াম ইনস্টিটিউট

২৫-২৯ ডিসেম্বর : ৪১ তম সারা বাংলা নাট্যোৎসব, স্থান : কমিউনিটি হল, ফালাকাটা

পঞ্চম মাল নাট্যোৎসব

আয়োজক : মাল অ্যাক্টোওয়ালা
স্থান : রবীন্দ্রভবন, সুভাষিণী বালিকা বিদ্যালয়

৯ ডিসেম্বর : তোমাকে চাই ও টুনটুনি লো
প্রযোজনা : বারাসত অনুশীলনী

১০ ডিসেম্বর : শল্য পর্ব
প্রযোজনা : বারাসত অনুশীলনী

১১ ডিসেম্বর : অর্ধাঙ্গিনী
প্রযোজনা : বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন

১১ ডিসেম্বর : সেই ছেলেটা
প্রযোজনা : ডামডিম যুব নাট্য সংস্থা

১২ ডিসেম্বর : গোবরা পালিয়েছে
প্রযোজনা : গাজোল বিষাণ

১২ ডিসেম্বর : বিরতির পরে
প্রযোজনা : মাল অ্যাক্টোওয়ালা

১৩ ডিসেম্বর : দিনান্তের আলো
প্রযোজনা : অনুযুগ, হাওড়া

১৩ ডিসেম্বর : সাকিন, প্রযোজনা : সঙ্ঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা, আলিপুরদুয়ার

ত্বকের ভেষজ রূপচর্চা

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

আজ আমাকে ভেষজ রূপচর্চা সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়েছে। আমি প্রথমে আলোচনা করব কীভাবে ভেষজের ব্যবহারে আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের চারপাশে বহু ভেষজ জিনিস ছড়ানো আছে। যেমন ফুল, ফল, লতা, গুল্ম ইত্যাদি— এদের গুণাবলী অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়। তবে অবশ্যই জানতে হবে কোনটা কীভাবে এবং কোন ত্বকে কেন প্রয়োগ করতে হয়। প্রত্যেক মানুষের যেমন আলাদা ব্যক্তিত্ব থাকে তেমনই প্রত্যেক ত্বকের নিজস্ব সত্ত্বা আছে সেই অনুযায়ী রূপচর্চা করতে হয়। ভেষজ বলে সবাই সব কিছু লাগাতে পারবেন এটা ভাবার কোনও কারণ নেই, কেন? তার কারণ, প্রতিটি ফুল, ফল, লতার নিজস্ব যে গুণাবলী আছে তা আপনার ত্বক, চুল ও শরীরকে দেয় উজ্জ্বলতা, স্বাভাবিকতা, মসৃণতা, ভিটামিন। মুখকে করে দাগমুক্ত ও বলিরেখা মুক্ত। আর শরীরকে করে তোলে সজীব ও সুন্দর। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেলে যেমন শরীর খারাপ করে, ঠিক তেমনই ত্বকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ব্যবহার করলে ক্ষতিও হয়।

তাই কীভাবে ঘরে বসে ভেষজের সাহায্যে আপনি আপনার ত্বক ও চুল পরিচর্যা করবেন, সেই সমন্ধে কিছু আলোচনা করি।

শুকনো ত্বক হলে আলুর রসের সাহায্যে পরিষ্কার করবেন। এতে আছে পটাসিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক ও ক্লোরিন। এর ফলে ত্বকের শুকনো ভাব দুর হবে। এছাড়া কমলার রস ও মধু কিংবা কমলার রস ও দুধ মিলিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। এগুলো লাগিয়ে কিছু সময় রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। মুখের উজ্জ্বলতা ফেরাতে ও পরিষ্কার করতে দুধ অতুলনীয়। এক কাপ মাঠা সমেত দুধ আধখানা লেবুর রস আর এক চামচ গ্লিসারিন মিশিয়ে রেখে দিন আধ ঘন্টা। তার পর রাতে শোয়ার সময় মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়ে সারা রাত রেখে দিন। সপ্তাহে একদিন অন্তত মুখে মালিশ করবেন দই লাগিয়ে। কিছুক্ষণ মালিশ করে ১৫-২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন। এতে হারানো আদ্রতা ও উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে। কাঠবাদাম, গোলাপের পাপড়ি দুধের সঙ্গে বেটে নিয়মিত মুখে মাখলে উজ্জ্বলতা বাড়বে। সপ্তাহে একদিন মালিশের পর মুখে মাস্ক নিলে ত্বক হবে দাগ ও বলিরেখা মুক্ত। মাস্ক কখনও চোখের নিচে লাগাবেন না। মুসুর ডালের গুঁড়ো, এক টেবিল চামচ কাঠবাদামের গুঁড়ো, ডিমের কুসুম ২ চামচ ও গোলাপ পাপড়ি বেটে দুধের সাহায্যে গুলে মুখে ও গলায় লাগাবেন, মাস্ক শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, তার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন। পাকা পেঁপের মাস্কও খুব উপকারী, এটা লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ জলে মুখ ধুতে হবে। এমন করে যত্ন করলে ত্বক হবে উজ্জ্বল ও কমনীয়।

তৈলাক্ত ত্বক দিনে দুই থেকে তিনবার পরিষ্কার করা উচিৎ। যেমন— শশার রসের সাহায্যে অথবা লেবু ও টোম্যাটোর রস দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। এছাড়া গোলাপ জলের সঙ্গে মুগ ডালের গুঁড়ো, কাঠবাদামের গুঁড়ো, ১/২ কৌটা লেবুর রস ও ১/২ চামচ চিনি দিয়ে নাকের পাশে ও মুখে ভাল করে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে দিন। তার পর ঠান্ডা জলের সাহায্যে হাল্কা হাতে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলবেন। এটা সপ্তাহে একদিন করে করলে ভাল হবে।

ব্রণর দাগ থেকে মুক্তি পেতে ছোলা ভিজিয়ে বেটে লাগালে দাগ ধীরে ধীরে চলে যায়। গোলাপ পাঁপড়ি দুধের সঙ্গে বেটে লাগলেও দাগ মুক্ত হওয়া যায়।

রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেল আইডি-তে।

মালা দাস, অঙ্গনা বিউটি ক্লিনিক, শিলিগুড়ি

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চশমা বা কোনও ওষুধ আপনার চোখের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে

চোখের সাধারণ সমস্যা থেকেই একদিন দৃষ্টিশক্তি কমজোরি অথবা অন্ধত্ব আসতে পারে। তাই চোখ নিয়ে কোনও রকম হেলাফেলা নয়। জানাচ্ছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. ডি বি সরকার

চোখ ব্যথা, স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া— এই সব লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে কখনই দেরী করবেন না। এ সব ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞর পরামর্শ সব সময়ই নেওয়া উচিত। চিকিৎসককে চোখ না দেখিয়ে, চোখের পাওয়ার বা চশমা নেওয়ার মানে হল নিজের চোখের ক্ষতি করা। কারণ, চোখের ভেতরের অসুখ কিংবা দৃষ্টিশক্তির অসচ্ছতা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা ছাড়া কোনও ভাবেই বোঝা সম্ভব নয়। ব্লাড সুগার, গ্লুকোমা, মাইনাস পাওয়ারের রোগিদের নিয়মিত ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তা না হলে যে কোনও সময় চোখ বা দৃষ্টিশক্তিতে অসুবিধা ঘটতে পারে।

ডা. ডি বি সরকার

যে সমস্ত শিশুর চোখ ট্যারা, চোখে সাদা স্পট আছে, বিশেষ করে কম ওজনের নবজাতকদের চোখ অবশ্যই নিয়ম করে চিকিৎসককে দেখাতে হবে। চোখ অতি ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয়। চোখের সাধারণ সমস্যা থেকেই একদিন দৃষ্টিশক্তি কমজোরি অথবা অন্ধত্ব আসতে পারে। তাই চোখ নিয়ে কোনও রকম হেলাফেলা নয়। চোখে সামান্য আঘাত লাগলে অথবা দেখতে সামান্য অসুবিধা হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি, বিশেষ করে শিশু বা বয়স্কদের।

চোখ যেহেতু সবথেকে বেশি মূল্যবান ইন্দ্রিয়, সেই কারণে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ চোখের হাসপাতালেই সব সময় চোখের পরীক্ষা ও অপারেশন করা উচিত বলে জানালেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডি বি সরকার। তিনি এ-ও বলেন, জন্মের পর যে সমস্ত নবজাতককে অক্সিজেন দিতে হয়েছে তাদের অবশ্যই রেটিনা পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি এবং সেটা ছয় সপ্তাহের মধ্যে। তাছাড়াও যে সমস্ত শিশুর চোখ বিড়ালের মতো জ্বল জ্বল করে তাদের ক্ষেত্রেও চোখের ডাক্তার দেখানো খুব দরকার।

শিশুদেরও জন্মগত ছানি হতে পারে। এ ধরনের ঘটনায় অনেক সময়ই নানাবিধ কার্য-কারণ থেকে তারা দৃষ্টিশক্তি হারায় অথবা তাদের দৃষ্টিশক্তি তৈরি হয় না। তাই আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমেই চোখের অপারেশন করা যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে শিশুদের ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যেও চোখের অপারেশন হয়ে থাকে। ছানি আসলে চোখের লেন্স। এই লেন্স দিয়ে চোখের মধ্যে আলো নিয়ন্ত্রিত ভাবে ফোকাস হয়। লেন্সে অসচ্ছতা এলে তখন তাকে ছানি বলে। ছানির চিকিৎসা কখনই ওষুধ নয়, অপারেশন। মাইক্রো ফেকো হচ্ছে সর্বাধুনিক পদ্ধতি। এই যন্ত্র কোচবিহার শহরের এই চিকিৎসা কেন্দ্রে রয়েছে।

গ্লুকোমা প্রসঙ্গে ডা. সরকার বলেন, এটা এখন একটা রোগ যার ফলে চোখের নার্ভ শুকিয়ে যায়। গ্লুকোমার দুটি দিক আছে, একটি ওপেন অ্যাঙ্গেল ব্লকেট অন্যটি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার। গ্লুকোমাতে চোখ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অন্ধত্ব আসার আগেই বিশেষ পরীক্ষা করালে সেটা ধরা পরে। তবে সঠিক চিকিৎসা করালে সম্পূর্ণ সেরেও যায়। ডায়াবেটিসের প্রভাব চোখেও পড়তে পারে বলে জানান ডা. সরকার। তাই ডায়াবেটিস রোগির নিয়মিত চোখ দেখানো প্রয়োজন, অন্যথায় রেটিনা খারাপ হয়ে অন্ধত্ব আসতে পারে। তার চিকিৎসায় প্রয়োজন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি।

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ চোখের হাসপাতাল

Dr. D.B. Sarkar Eye Hospital

ডা. ডি বি সরকার আই হসপিটাল প্রা. লি.

আর আর এন রোড, কোচবিহার

ফোন ০৩৫৮২-২২৯২২৪, ২২৩২২৪, মোবাইল ০৯৯৩২০৬৩৫০৭

এটি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনা (RSBY) এবং West Bengal Health Scheme অন্তর্ভুক্ত চোখের হাসপাতাল

পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁর একটাই ব্রত

গোটা বাংলায় বোধহয় এই একটিই উদাহরণ রয়েছে। কোচবিহার শহরের এক গুরুত্বপূর্ণ পথের নামকরণ ও পরিচিতি স্থানীয় একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার নামে। ত্রৈমাসিক থেকে শুরু করে মাসিক, ক্রমে পাক্ষিক হয়ে সাপ্তাহিক, যা আজও প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে রাজ্যের প্রান্ত জেলা কোচবিহার থেকে। আর তার প্রাণপুরুষের নাম রণজিৎ দেব। ১৯৬৪ সালে প্রথম প্রকাশ হয় 'ত্রিবৃত্ত' নামের পত্রিকাটি রণজিৎ দেবের সম্পাদনায়। সেকাল একালের মতো ছিল না। সেই সময়ের প্রধান পরিবহণই ছিল পা। কোচবিহার দেওয়ানহাটের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টুপামারি গ্রামে খুব ছেলেবেলাতেই বাবার সঙ্গে ওপার থেকে চলে আসেন রণজিৎ, বাবা-মা, দিদিমাসহ পাঁচ ভাই। বাবা ভবেশচন্দ্র দেব ছিলেন চিকিৎসক। বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাই ছিল যাঁর নেশা। অবস্থাপন্ন পরিবার। একই গ্রামে পৃথক বাড়িতে দিদিমার কাছেই রাত কাটাতেন রণজিৎ। বৃদ্ধা দিদা ভোরের কীর্তন শোনাতেন ছোট্ট রণজিৎকে। বোধহয় সেই থেকেই কবিতা লেখার বাসনা জাগে। গ্রামের আরও দুই তরুণ রামবিলাস রবি দাস, সুকুমার চৌধুরী সেই কৈশোরেই জুটে যায়। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হতেই ১৯৫৯ সালে 'সবুজ পাতা' নামে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে এই তিনজন। এর পর 'সবুজ পাতা হলদে কুঁড়ি' নামে প্রথম কবিতার বই প্রকাশ ১৯৬২ সালে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এই সময় কবিতা লিখছেন তিনজন একই গ্রাম থেকে, চূড়ান্ত উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাটিয়েছেন সেই দিনগুলো। কোচবিহার শহর থেকে তখন প্রকাশিত হত 'আহ্বায়ক' নামের একটি পত্রিকা। অতি উৎসাহে প্রায় ১৪ মাইল হেঁটে পত্রিকা দপ্তরে কবিতা জমা দিতে এসে একরকম অপমানিত হয়েই ফিরে যান তরুণ রণজিৎ। ক্ষোভে-দুঃখে নিজেই উদ্যোগ নিলেন কবিতার কাগজ প্রকাশের। ১৯৬৪-তে সেই তিন বন্ধুর উদ্যোগে শুরু হল 'ত্রিবৃত্ত'। তিন বন্ধু যেন তিনটি বৃত্ত। একই সঙ্গে রবীন্দ্র-পূর্ব, রবীন্দ্র-সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-উত্তর যুগ ভাগ করে ত্রিবৃত্ত প্রকাশ হতে শুরু করে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নন্দগোপাল সেনগুপ্তরা কবিতা লিখেছেন এখানে। 'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কবিতা সংগ্রহ করতেন রণজিৎ দেবরা। সেই সময় যোগাযোগ হয়ে যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখক-কবিদের সঙ্গে। চলে কবিতার আদানপ্রদান, চিঠি দেওয়া-নেওয়া ও নিয়মিত সাক্ষাৎ।

ছয়ের দশকের শুরুতে দাদার চাকরির সুবাদে গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেন। মেসে থাকতেন দুই ভাই। পরবর্তীতে চাকরিতে যোগ দেন রণজিৎ। এর পর রবীন্দ্রনগর এলাকায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন দুই ভাই। 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকার পরিচিতি ছড়াল রাজ্য জুড়ে।

কাব্য-সাহিত্যচর্চা ও নিয়মিত 'ত্রিবৃত্ত' প্রকাশ করার পাশাপাশি চাকরি করতে করতে মনে হল, আরও মানুষকে লেখার সুযোগ তৈরি করে দিতে চাই আরও বড় প্ল্যাটফর্ম। মাথায় এল দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা। চলল প্রস্তুতি।

১৯৯০ সালে শুরু হল দৈনিক। কলকাতা থেকে সাংবাদিক ও কুশলীদের দল এনে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা শুরু হয়েছিল দৈনিক 'ত্রিবৃত্ত'। প্রত্যন্ত কোচবিহার শহর থেকে পূর্ণাঙ্গ দৈনিকের সাহস আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে সত্যিই দুঃসাহসিক ছিল। বাস্তব ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে বহু দূরে থাকা কবি রণজিৎ দেবের পরিণতিও তা-ই হল। তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন, সাহিত্যচর্চা আর কারখানা চালানো এক কাজ নয়। ওই দৈনিকের স্থায়িত্বকাল হয় মাত্র ছয় মাস। দৈনিক করার তাগিদে রণজিৎ দেব সরকারি চাকরিও ছেড়েছিলেন। ফলে অসময়ে হলেন বেকার। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সংসার চালানোই তখন দায়। স্ত্রী শাশ্বতী দেব কলকাতার মেয়ে। শ্বশুরবাড়ির সাহায্যেই চলত সংসার। প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো হত শাশ্বতীদেবীর

রণজিৎ দেব

কাব্যগ্রন্থ : প্রভু অন্ধকারে আমি একা, শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ, হেমন্তের সকাল ও একসারি বালিহাঁস, কথা ছিল, অঝোরে বৃষ্টিপাত, নির্জনভূমিতে জলপ্রপাত, মধ্যরাতের বিশল্যকরণী, হাওয়ার মিথুন, পাহাড়ি ঢল, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, মেঘের গায়ে বসতবাটি।

গল্প গ্রন্থ : ভাবনা ও তারপার।

প্রবন্ধ গ্রন্থ : সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ রাজদরবার, কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ, এক নজরে উত্তরবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস, কোচবিহারের প্রাচীন ইতিহাস, দার্জিলিংয়ের ইতিহাস, লোকসাহিত্যে ভাওয়াইয়া, কোচবিহারের রাজকাহিনি, মহারানি সুনীতি দেবী, উত্তরবঙ্গের চিঠি, কোচবিহারের ইতিবৃত্ত, উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত, রাজকন্যা গায়ত্রী দেবী, পত্র সাহিত্যে রাজদরবার, কোচবিহার জেলার দেবদেউল, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, কোচবিহার জেলার ইতিহাস, উত্তরবঙ্গের জনজীবন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, উত্তরবঙ্গের পূজা ব্রত ও উৎসব।

সম্পাদিত গ্রন্থ : সবুজ পাতা হলদে কুঁড়ি, উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত গল্প, কোচবিহারের ইতিহাস (সংযোজনসহ, আমানতউল্লা আহমদ রচিত), জলপাইগুড়ি জেলার ইতিবৃত্ত, গোসানি মঙ্গল।

সম্পাদিত পত্রপত্রিকা : ত্রিবৃত্ত, আধুনিক সাহিত্য, দৈনিক ত্রিবৃত্ত, পূর্বোত্তর।

পুরস্কার, সম্মাননা : 'শব্দের পূজারী' পুরস্কার, উত্তর সীমান্তবঙ্গ পুরস্কার, সন্ধানী পুরস্কার, দি আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট পুরস্কার।

বিশেষ পুরস্কার : পশ্চিমবঙ্গ ছোট পত্রিকা সমন্বয় সমিতি, অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, আলিপুরদুয়ার স্মারক সম্মান, উত্তরবঙ্গ গৌরব সম্মান, দরিয়া সম্মান, কবি সম্মাননা, বইমেলা রত্ন (উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটি), অরিত্র সম্মান, প্রতিভা সম্মান, মধুমিতা নন্দী স্মৃতি পুরস্কার (নোনাই সাহিত্য চক্র)।

বাপের বাড়ি থেকে। সে বড় দুঃসময়। দৈনিক করতে গিয়ে সব খুইয়ে নিঃস্ব রণজিৎ তখন বড় একা। ফের বাঁচার তাগিদে পেশা করলেন লেখালেখিকেই। সাপ্তাহিক 'ত্রিবৃত্ত' ফের বার হতে শুরু করল।

'ত্রিবৃত্ত' লিটল ম্যাগ হিসেবে যেমন বাংলার কাব্য-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তেমনই ত্রিবৃত্ত পুরস্কারের কথা না বললেই নয়। ১৯৭১ থেকে এই পুরস্কার চালু হয়। ওই বছর কাব্যে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর সাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই পুরস্কার পান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, জীবন সরকার। ১৯৭৫-৭৬ সালে পান শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত। তেমনই ১৯৯৬-৯৭-এ সুচিত্রা ভট্টাচার্য। এই পুরস্কার এখনও নিয়মিত প্রদান হচ্ছে। ত্রিবৃত্ত পুরস্কার পাওয়ার পর অনেকেই আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। সুনীল, শক্তি, শীর্ষেন্দুর ক্ষেত্রে তো এমনটাই হয়েছে।

ত্রিবৃত্তকে ঘিরেই মূলত জীবনচর্চা রণজিৎ দেবের আজও একই রকম অব্যাহত। মাঝখানের কঠিন সময়টুকু তাঁকে যেমন মানুষ চিনতে সাহায্য করেছে, তেমনই জীবনকে আরও বেশি কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রণজিৎ দেবের সাধনা ও শ্রমের ফসলে সমৃদ্ধ হয়েছে ডুয়ার্সের মাটি। এখানে একটি পথের নাম যে ত্রিবৃত্ত সরণি হবে— এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

কবি রণজিৎ দেব

'এ যুগের সমস্তরকম যুগলক্ষণই এঁর কবিতার মধ্যে প্রাপ্তব্য। তারই সঙ্গে জড়িত আছে একটি আধুনিক মানস—যা উত্তরবাংলার আকাশ-বাতাসের নিজস্ব চেতনায় উজ্জ্বল।' তরুণ কবি রণজিৎ দেব সম্পর্কে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিজ্ঞান-বার্তার পর দুরন্ত সময় এবং রণজিতের কৃতক্রিয় লেখনী পেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ পথ। ইত্যবসরে অনুধ্যান, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠায় রণজিৎ বাংলার কাব্যজগতে তাঁর অনুপম মাধুর্য ও মেধাবী রোমান্টিক উচ্চারণে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। উত্তরের কবি বা কোনও বিশেষ দশকের কবি এমন অবান্তর অভিধা ছিন্ন করে রণজিৎ দেব আজ বাংলার কবি। পাশাপাশি গদ্যকার এবং লোকসংস্কৃতি গবেষক হিসেবেও আজ তিনি অন্যতম মান্য ব্যক্তিত্ব। তবুও তাঁর কাব্যমন এবং মননের অবাধ-অন্তরঙ্গ বিচরণভূমি আজও, শক্তি চট্টোপাধ্যায় অভিজ্ঞাত উত্তর তথা ডুয়ার্স। কবি এখানে সমর্পিত প্রকৃতি এবং মানুষের সত্তায়। সীমিত পরিসরে সমগ্র রণজিতের পর্যেষণা স্থগিত রেখে আমরা ডুয়ার্সের আলোছায়ায় খুঁজে নেব তাঁকে। অথবা তাঁর কবিতার মুকুরে দেখে নেব ডুয়ার্সের মুখ।

কবি রণজিতের অস্তিত্বের গভীরতম নির্যাস ছড়িয়ে আছে ডুয়ার্সের আদি-অনন্তকালের প্রাকৃতিক পরিবেশে। এখানেই তিনি স্থিত। এই মায়াবী ভুবনে কবির আমন্ত্রণ কখনও আঁধারি জ্যোৎস্নায়, কখনও বনজ গন্ধি জঙ্গলে :

'ডুয়ার্স সুন্দরী আমার
আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়ে কোথায় ছুটেছ
নরম রোদ্দুর পিছু নেয় সোঁদা-ঘ্রাণ মেখে
হাসিখুশি নবীন গাছেরা আজ
দেখে, চাঁদ বসে আছে ডালে'
(ডুয়ার্স সুন্দরী আমার)

রণজিতের কবিতায় ডুয়ার্সের পাহাড়-ঝোরা-জনপদ ভাষার আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে ক্বচিৎ দেহতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঃ

'পাহাড়-ঝোরা ফুঁসছে, নামবে রায়মাটাং
ফুন্টসোলিং না তোর্সার দুরন্ত স্রোতে
ভাবতে দিল না বিন্দুমাত্র 'আঙ-সাঙ'
ঝোরা, নামল জঙ্ঘা ও উরুতে।' (ঝোরা)

রোমান্টিক কবি রণজিতের অনুভব ও কাব্যশৈলী আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় প্রকৃতির নাভিমূলে, যেখান থেকে একসারি বালিহাঁসের সঙ্গী হয়ে আমাদের মন অলক্ষ্যে হেমন্ত-প্রভাতের জন্মক্ষণের সাক্ষী হয়ে যায় :

'ভিজে ঘাস শুয়ে থাকে তোমার শরীরে
শুধু চোখ তন্দ্রাহীন নিথর কখনও বৃত্তের
পরিধির কখনও ভাষা। ঠোঁট দু'টি কেঁপে ওঠে,
ক্ষণিকে মিলালে চাপা গর্জন করে জলপ্রপাত
ভাঙে বালির পাহাড় ও পাথর, ধসে রাজবাড়ি,
একসারি বালিহাঁস উড়ে ক্রমে হেমন্তের সকাল
হয়—' (হেমন্তের সকাল ও একসারি বালিহাঁস)

আবার হাওয়ার মিথুনের প্রতীকে আশ্চর্য নিপুণতায় কবি নিজেকে একাত্ম করে নির্মাণ করেন নির্জন বনস্থলীর কাব্য :

'কখন আমি এসে গেছি এই চিলাপাতার বনে
কখন যে মেতেছি আমি মৈথুন ক্রিয়ায়
হাওয়ার মিথুন
হায় হাওয়ার মিথুনে আমি
পায়ে পায়ে কখন এসে গেছি।'
(হাওয়ার মিথুন)

কখনও নিখুঁত চিত্রণে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে তাঁর টুপামারির কৈশোর স্মৃতি আর যৌবনের রামধনু কাল :

'এখানে ধানখেতে খেতে দেয় চাষি বউ
নৌকায় খাওয়ায় জেলেরে গৃহিণী
ঢিল ভেঙে পনেরো দিনের বাছুর দৌড়োয়
সোহাগে লতায় জড়ায় হরিণ-হরিণী।
এখানে তোর্সার জল জল-ছোঁয়া আকাশে
রামধনু সাত রং স্পষ্ট হয়ে আছে,'
(এখানের চোখ)

কখনও তাঁর কবিতায় অবাক সারল্যে নির্মিত হয় বাগিচা সুন্দরীর প্রতিমা :

'চুলে গোঁজা লাল ফুল নিতম্বে দোলে চায়ের ঝুড়ি
স্বদেশীয় নারীর স্তনে আকুল হয়ে বলি ডুয়ার্স
সুন্দরী...' (জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স সুন্দরী তুই)

রোমান্টিক কবি রণজিৎ ডুয়ার্সে মুগ্ধ। কিন্তু বিলাসী কবিমাত্র নন তিনি। রোমাঞ্চঘন উজ্জ্বল প্রহর ও উচ্চাবচ বেদনাময় অন্ধকার যাম অতিক্রমী কবি জানেন আলো-আঁধার ঘেরা জীবনের মর্মার্থ। তাঁর কবিতায় প্রেম এসেছে নম্র উচ্চারণে। ব্যক্তিগত যন্ত্রণা খেলে নগন্য সৃজনে। কিন্তু ডুয়ার্সের যন্ত্রণায় ক্লিশিত কবির দৃষ্টি ডুয়ার্স সুন্দরী কিংবা স্বদেশীয় মেয়ের ফুল গোঁজা খোঁপা ছাড়িয়ে বারবার চলে গিয়েছে চা-বাগানের অন্দরের অন্ধকারে :

১
'চা-বাগান বন্ধ
বড় বেদনায় কাটে রুমলি ঝিমলির নিদারুণ রাত
দেখে যা কেমন আছে উত্তরে নদী ও খাদ'
(আয় চলে আয়)

২
'বিগত শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে থাকব না আমি, ওই দেখ
থেঁতলে পড়ে আছে পিতৃসুখ, মাকে আজও চিনি না
আমি
শুনেছি ম্যানেজারবাবু তাকে মদের পেয়ালায়
চুমুকে খেয়েছে' (চা-বালিকা আমি)

৩
'এতটা বছর গেছে এমন তো দেখেনি সে
চা-গাছের ডাল পেয়ে সাপেরা ঝুলছে
আগাছা পরিপূর্ণ, নিরালম্ব শোক মনস্তাপ
আদিবাসী কণ্ঠ তাই চিরে যায় অকারণ ক্রোধে।'
(দুখিনী মা)

রণজিৎ জানেন ভালমন্দ সব। সবকিছু মিলেই তাঁর ভালবাসার জগৎ ডুয়ার্স। তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষাও ডুয়ার্সেরই কথা বলে ঃ

'কতকালের সাধনা আমার এই ডুয়ার্সে জন্মেছি
সাধনা আমার মৃত্যু যদি হয়
ঘুমোই যেন পাতার জাজিমে
ছড়িয়ে দিয়ো দৃশ্যময় আঁচলের টেরাকোটা
জন্মান্তরের দিকে—'

নিসর্গ ও মানবসত্তার অনুবর্তী মমত্বে নিষিক্ত অনুভব মেধাবী সৃজনে কবিতা হলে ছিন্ন হয় তার মানচিত্রের বন্ধন। ডুয়ার্সের কবি হয়েও রণজিৎ দেব, অতএব বাংলার কবি।

রামকানাই দাস

বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

কলকাতার যেমন একটা ময়দান আছে, মালবাজারেরও আছে। আকার বা আয়তনে কলকাতার সঙ্গে তুলনা চলে না। মালবাজার ময়দানের গুরুত্ব তাতে কলকাতা ময়দানের চেয়ে কিছুমাত্র কমে না। প্রিয় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি কোন ময়দানের কথা বলছি? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। মাল কলোনী ময়দান। কেউ কেউ বলেন রথ-মেলার মাঠ। কেউ বা বলেন, আর আর স্কুলের মাঠ। তবে যে নামেই ডাকা হোক না কেন মাল শহরের কেন্দ্রে এই মাঠ হল মালবাজারের ফুসফুস। ঠিক কলকাতার ময়দানের মতোই।

আয়তকার ওই মাঠের দক্ষিণপ্রান্তে রয়েছে মালবাজারের বহু পুরনো আর আর প্রাথমিক বিদ্যালয়। শহরের ছেলেমেয়েদের বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানোর প্রবণতা বেড়েছে। ফলে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তা সত্ত্বেও শহরের নিম্নবিত্ত এবং পাশের পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে আজও ভরসা আর আর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

স্কুল সংলগ্ন এই মাঠে ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলো করে, সকাল থেকে রাত অবধি ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলে শহরের নানা প্রান্তের ছেলেমেয়েরা। তাছাড়া বিকেল থেকেই মাঠ জুড়ে বসে নানা আড্ডার। নবীন থেকে প্রবীণ কে নেই সেই আড্ডায়।

শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান— রথের মেলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কিংবা রাজনৈতিক সভা অথবা যাত্রার আসর। তাছাড়া দুর্গা পুজো, কালী পুজো, দোল যাত্রা যে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য মাল কলোনী ময়দানের জুড়ি মেলা ভার। কারণ আর যাই হোক এই ময়দানে কখনও দর্শকের অভাব হয় না।

মাল পৌরসভা সেই ভাবনাতেই শুরু করেছে মাল কলোনী ময়দান সংস্কারের কাজ। মাঠের এবরোখেবরো জায়গাগুলোকে সমান করতে

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

ট্রাক্টর দিয়ে চষে ফেলা হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে মাটি ফেলে উঁচু করা হয়েছে। সারা মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘাসের বীজ। মাঠের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছে টিনের ছাউনি দেওয়া একটি সুদৃশ্য বসার জায়গা। সেখানে বিকেল বেলায় শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবীণ নাগরিকরা আসেন ও গল্প-আড্ডায় মেতে উঠেন।

ময়দানটি পৌরসভার যে ওয়ার্ডের অর্ন্তগত অর্থাৎ ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা সমর কুমার দাস (অমল) জানালেন যে, এই রকম আরও তিনটি বসার জায়গা মাঠের বাকি তিন দিকেও তৈরি করা হবে। যার একটি নির্দিষ্ট থাকবে মহিলাদের জন্য। এছাড়া মাল পৌরসভার পক্ষ থেকে অদূর ভবিষ্যতে মাঠটিকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে এই প্রথম মাল কলোনী ময়দানের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবী সমরবাবুর।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় শহর মালবাজার। মাল পৌরসভার পৌরপতি স্বপন সাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় দ্রুত বদলাচ্ছে মাল কলোনী ময়দান। মালবাজারের প্রতিটি নাগরিকও চান মাল শহরের ফুসফুস কলোনী ময়দান ভরে যাক নতুন বাতাসে। কারণ ফুসফুস তরতাজা থাকলে তবে না শরীর-মন ভাল থাকবে!

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ডুয়ার্সের ডিশ

হারিয়ে যাওয়া সব রাজবংশী খাবার

ফিরে আসতে পারে না 'এথনিক ডিশ' হয়ে?

সেকালে ডুয়ার্সের জলবায়ুতেই ছিল আলস্যির আর নানান রোগভোগের বীজ— কৃষিজীবী রাজবংশীদের খাদ্যাভ্যাস সেইভাবেই গড়ে উঠেছিল। যুগের পরিবর্তনে ও প্রয়োজনীয়তায় সেইসব খাবারেও অভিযোজন ঘটেছে, বিলুপ্তির পথে সেইসব সাবেক খাদ্য রীতি। আজ যখন সাবেকি হস্তশিল্প বা গানবাজনা ইকো পর্যটনের পসরায় সাজিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে, তখন মনের কোণে সত্যিই প্রশ্ন জাগে— সামান্য আধুনিকতার ছোঁয়া এইসব হারিয়ে যাওয়া ডিশকে ফিরিয়ে আনা যায় না বুটিক রেস্তরাঁর পাতে?

ছবা পোড়া— রাজবংশী লোকায়ত জীবনাচরণে আলু, মাছ, সেগালু (মিষ্টি আলু), বাইগন (বেগুন), ছবা প্রচলিত। সম্ভবত আদিম শিকারকেন্দ্রিক জীবনাচরণ প্রকৃতির প্রকাশ এরূপ খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে নিহিত আছে। মাছ ছবা রাজবংশীদের খাদ্যতালিকায় একটি বিশেষ স্থান লাভ করে এসেছে। মাছের মধ্যে বিশেষ করে চ্যাং, টাকি, খট্টি-পুঁটি, শোল ইত্যাদি আঁশযুক্ত মাছই পুড়িয়ে খাওয়া হয়।

রাজবংশীদের রান্নাঘরের বারান্দায় বা খোলা আকাশের নিচে ঘরের শুলকির কাছে একটি করে উনুন থাকে; যেখানে ধান সেদ্ধ, সোডার জলে কাপড় সেদ্ধ করা হয় বা সকালের চা-জলখাবার চিঁড়ে ভাজার কাজ ও শীতকালে আগুন পোহানো হয়। সেখানেই মাছ ছবার কাজটি করা হয় খড়ের আগুন, তুষের বা পাট শোলার আগুনে। আগুনে ঝলসানো মাছ উপরের চামড়ার আঁশ ও কাঁটা ছাড়িয়ে সরষের তেল, নুন, কাঁচা লংকা বা শুকনো লংকা আগুনে পুড়িয়ে ভালো করে মেখে প্রস্তুত করা হয় মাছ ছবা। খরখড়া (বাসি ভাত), পানতা ভাত, চিঁড়ে চ্যাপ্পা গুড়া (চাল থেকে প্রস্তুত চিঁড়ে) সহযোগে সকালের খাবারের সঙ্গে খাওয়া হয়। পোড়া আলু বা বাইগনও খোসা ছাড়িয়ে তেল, নুন, লংকা, পেঁয়াজ মেখে আলু সানা বেগুন সানা প্রস্তুত করা হয়।

সিজা— সকালে বা সন্ধ্যায় সাধারণত ধান

সেদ্ধ করার প্রচলন রাজবংশী সমাজে। ধানের কড়াইতে আলু গরম ধানের ভেতর চাপা দেওয়া হয়। ধান সেদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুও সেদ্ধ হয়ে যায়। পরে খোসা ছাড়িয়ে লংকা, নুন মেখে খাওয়া। একে 'সিজা' বলে।

ভাজি— সাধারণ বাঙালিদের মতো আলু, পটোল, বেগুন, নানা শাকসবজির ভাজি খাওয়ার রীতি প্রচলিত থাকলেও, রাজবংশীদের মধ্যে পুঁটি মাছের ভাজি খাওয়ার এক বিশেষ পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোনও তেলের ব্যবহার নেই। মাছের খোসা ছাড়ানো হয় না। শুধু পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বার করে জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে লোহার কড়াইয়ে ভাজা হয়। অতীতে অতি দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতিতে মাছ ভাজা খাওয়া লক্ষ করা যেত।

ছ্যাকা-শাক— 'ছ্যাকা' এক প্রকার ক্ষারজাতীয় তরল পদার্থ। 'আটিয়া কলা' গাছের গোড়ার অংশ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। ছ্যাকা সহযোগে যে তরকারি রান্না করা হয়, তাকে ছ্যাকা শাক বলে। আটিয়া কলা আর ঘটিয়া দই রাজবংশীদের প্রিয় খাবার। তা ছাড়া কলাপাতায় ভাত খাওয়া, কলার খোলে দই-চিঁড়ে খাওয়া, বিবাহ-অন্নপ্রাশনে কলা গাছের পাতায় খাবার রাজবংশী সমাজে বিশেষ প্রচলিত।

আটিয়া কলা (বিচি কলা) গাছের গোড়ার অংশ ছোট ছোট অংশ টুকরো করে কেটে রোদে শুকানো হয়। শুকনো টুকরোগুলো পরিষ্কার জায়গায় আগুনে পোড়ানো হয়। পোড়ানোর যে সাদা রঙের ছাই পাওয়া যায় তা ছোট মাটির পাত্রে বা লাউয়ের বস (লাউয়ের খোলার পাত্র)-এর সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পাত্রের মুখ শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে বাইরের বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। এই ছাই ছ্যাকার মূল উপাদান। এই ছাই দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা হয়। আর ছাই থেকেই হয় 'ছ্যাকা'।

'ছ্যাকা' প্রস্তুত করতে লাগে নারকেলের অর্ধেক খোলের ফুটোযুক্ত অংশ, যা ফানেলের মতো ব্যবহৃত হয়। ফুটোযুক্ত নারকেলের খোলের ফুটোর অংশে ছোবড়া বা থ্যাপনা ভাল করে গুঁজে দিতে হবে, যাতে জল দিলে একবারে জল বেরিয়ে যেতে না পারে। এবার সেই ছোবড়ার উপর প্রয়োজনমতো সংরক্ষিত (ছ্যাকা) ছাই দিয়ে খোল জলে পরিপূর্ণ করে দিতে হবে। আর খোলটা এমন একটি পাত্রে বসাতে হবে, যাতে জল ফুটো দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পাত্রে গড়িয়ে পড়তে পারে। খোলার নিচের পাত্রের ছাই নিঃসৃত লালচে রঙের ক্ষারযুক্ত জলই হল ছ্যাকার জল।

ঠাকুরি কলাই, কুলটি কলাই, সজনাপাতা, শুঁটকি মাছ, লাফা শাক ইত্যাদির সঙ্গে ছ্যাকা মিশ্রিত করে ছ্যাকা শাকের প্যালকা রান্না হয়।

ফোকতই— চিঁড়ে, মানিমুনির পাতা (থানকুনি) ইত্যাদির সঙ্গে ছ্যাকা মিশ্রিত করে ফোকতই রন্ধন করা হয়। এ ছাড়া গুজরি, টাকোয়া ইত্যাদি দিয়েও ভিন্ন ধরনের ফোকতই রন্ধন করা হয়।

শুকাতি— কোষ্টার পাত (পাটপাতা) রোদে শুকিয়ে শুকাতি প্রস্তুতি করা হয়। শুকাতি আসলে পাটপাতার শুকনো রূপ। পাটখেত থেকে পুষ্ট পাতা সংগ্রহ করে বাঁশের তৈরি চাইলন বা কুলোতে পরপর কয়েকদিন শুকানো হয়। পাতাগুলি শুকিয়ে গেলে মুড়িয়ে যায়। আর রং হয় ঘন কালো। শুকনো পাতাগুলি এমনভাবে পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়। সে জন্য মাঝে মাঝে রোদে পুনরায় শুকিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত ঘরে যখন কোনও সবজি থাকে না সে সময় শুকাতির সাহায্যে নানা পদের রান্না করা হয়। রান্নার পদ্ধতি অতি সহজ। লোহার কড়াইয়ে শুকাতি একটু ভেজে নিয়ে তাতে জল দিয়ে লংকা, রসুন, নুন দিয়ে একটু ফুটিয়ে নামানো হয়। আবার শুঁটকি মাছ ও ছ্যাকা সহযোগে শুকাতি রন্ধন হয়। কচি পাটপাতা, কচি কচুপাতা ও কাঁঠালের বিচির সঙ্গে ছ্যাকা সহযোগে পাটপাতার ছ্যাকা তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য, রাজবংশী শিশুদের কৃমি রোগ হলে শুকাতির জল খাওয়ানো হয়।

একদা রাজবংশী সমাজে পশুচারণার অন্যতম দিক ছিল 'বাথান'। বাথানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল 'দোই' শিল্প। তিস্তা, তোর্সা, রায়ডাক, কালজানি, সংকোশ, গদাধর, জলঢাকা ইত্যাদি নদীর তীরবর্তী এলাকাতে অতীতে 'বাথান' ছিল। তাই বাথানের তত্ত্বাবধায়ক মৈশাল উঠে এসেছে উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গানে। তার সঙ্গে 'গামছাবান্ধা দই' অর্থাৎ রাজবংশী জীবনাচরণের উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য 'বাথান' সংস্কৃতির হাত ধরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দই গারাম পূজার অন্যতম প্রধান উপকরণ। সকালবেলায় দই-চূড়া খাওয়ার রীতি রাজবংশী সমাজের চিরাচরিত প্রথা। দইয়ের মধ্যেও নানা প্রকার ভেদ আছে। যেমন— গলেয়া দই, ছাঁচি দই, ট্যাঙা দই, আমা-কাচা দই, গারস্তি দই ইত্যাদি। যিনি দইয়ের ব্যবসা করেন, রাজবংশী সমাজে তাঁর উপাধি হয়ে যায় 'দৈয়ার'।

বাঁশের কচি গাজা— বাঁশের কচি গাজা জলে সেদ্ধ করে রাজবংশী সমাজে খাওয়ার প্রচলন আছে। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি জগৎজীবন ঘোষালের পদ্মপুরাণে এরূপ খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও 'হাঁস দিয়া বাঁশের মসম' খাওয়ার পরিচয় রাজবংশী লোকগানে পরিলক্ষিত হয়।

দিলীপ বর্মা

রাসমেলা স্পেশাল

কোচবিহারের লোকায়ত জলছবি

এক

তুমি দূর দেশে যাচ্ছ? লোকচরিত্র বিষয়ে তেমন তো জ্ঞান নেই। কোচবিহারের বাইরে এই প্রথম যাত্রা? এ বিষয়ে তোমাকে কিছু উপদেশ দিই। মন দিয়ে শোনো—

আহাম্মক এক, যে পরের মালে করে টেঁক।
আহাম্মক দুই, যে পরের চালে তুলে পুঁই।
আহাম্মক তিন, যে ঋণ করে দেয় ঋণ।
আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থতা করে খায় মার।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ।
আহাম্মক ছয়, যে একের কথা আরে কয়।
আহাম্মক সাত, যে শ্বশুরবাড়ি খায় ভাত।
আহাম্মক আট, যে মাপকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নয়, যে ঘর থাকতে পরের ঘরে রয়।
আহাম্মক দশ, যে মাগির কথায় বশ।

নাও, এবার এই মন্ত্র যপ কর দেখি। এ বিপদতারণ মন্ত্র তোমাকে সুরক্ষা দেবে—

পূর্বে রাজা বন্দি পাঙো ভানু ভাসাঙ্কর।
উত্তরে কালিকা বন্দো দক্ষিণে সাগর।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাঙো পাড়ুয়ায় পঞ্চনীর।
যাহার কালেমার চোটে পাথর মেলে চির।।
... .
মদনমোহন বন্দি বন্দি সত্য পীর।
বানেশ্বর শিব বন্দি বন্দি গোসানী মন্দির।।
পিতামাতাক বন্দি বন্দি শতজীবী।
যেখানে যতেক দেব বন্দিলাম সবই।।

আর বিলম্ব নয়। এবার যাত্রা শুরু কর। শুভ হোক তোমার। এ হচ্ছে কোচবিহারের লোকায়ত উচ্চবর্ণের শুভাশুভ বোধ।

দুই

কোচবিহার শহর সংলগ্ন গ্রাম খাগড়াবাড়ি। এই গ্রামে বিশ্বসিংহ ব্রাহ্মণ— পণ্ডিতদের বসতি স্থাপন করে দেন। এই গ্রাম সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নৃত্য-গীতে অভিনয়ে এ রাজ্যে পথ প্রদর্শক। এই গ্রামের শিব যজ্ঞের মাঠে লোকে লোকারণ্য। এক বিচিত্র সং দেখছেন জনতা, 'শিবের নিয়াও' সঙ। একজন হাতে বাঁকা লাঠি, পায়ে ঘুঙুর বিচিত্র সাজ মানুষ নেচে

নেচে গাইছেন—
ভূত প্রেত প্যাতানি শিবের বরযাত্রীগুলা
সগাঁয় আসি পিম্যি সোঁদাইল কানা ভেঙ্গুর নুলা।
(শিবের সগাঁয় সমান)
কারও বা নাকটা ধোঁদা কাঁহো বা গোঁদা
কারও হোতলাই হইলেক হিঙ্গি
কারও তল উপর দাঁতে একটা বাদে
নাগা যিদি সিদি।
(শিবের সগাঁয় সমান)

যিনি নেচে-গেয়ে আনন্দ দিচ্ছেন তিনি কিন্তু পয়সা নেন না। একেবারে বিনে পয়সার ভোজ। এই অনাবিল আনন্দে মেতেছেন পথচারী দর্শকের সঙ্গে চক্রবর্তী বাড়ির বউ-ঝি'রা, ভট্টাচার্যি বাড়ির উকিলবাবুরা, চৌধুরি বাড়ির বুড়োকর্তা ও জনখাটা কত মানুষ।

তিন

বুলবুলি গিন্নি গল্প করছিল শালিক গিন্নির সঙ্গে। এরা বানেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন জায়গার বাসিন্দা। বুলবুলি গিন্নি খুব গর্ব করে শুরু করলেন ঃ একদিন আমার শ্বশুরের শ্বশুর আলাইকুমারী নদীতে স্নান করতে গিয়েছে। সে স্নান করছিল উঠানে। আর ভাটিতে স্নান করছিল একটি হাতি। হাতি তো জঙ্গলের রাজা। স্নানের জল নোংরা দেখে সে এক শেয়ালকে পাঠাল আমার শ্বশুর ডোমনার (বুলবুল) কাছে। শেয়াল বললেন, 'তুমি হাতি মহারাজের স্নানের জল নোংরা করছ কেন?' আমার শ্বশুর বললেন, 'কে মহারাজ? প্রমাণ নিয়ে এসো।' শেয়াল দৌড়ে গিয়ে হাতির গা থেকে কয়েকটি লোম নিয়ে ফিরে এল। এবার আমার শ্বশুর করল কি একটা পড়ে থাকা সজারুর কাঁটা শেয়ালের হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও তোমার মহারাজের শরীরে এটা লাগিয়ে দিয়ে এসো।' শেয়াল হাতির গায়ে সজারু কাঁটা বিঁধিয়ে দিতেই হাতি তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বনে পালাল। এই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ।

চার

জানোই তো রাজারাজরার কত বিচিত্র সখ। কত যে রানি তার হিসেব কে রাখে। তাদের আবার ছেলেমেয়ে সে আরও গরহিসেব। একবার হল কি এই বানেশ্বরে কোচবিহারের এক মহারাজা বেড়াতে এলেন। একদিন সকালে এক সুন্দরী কন্যা ফুল তুলছেন। রাজা তাকে দেখেই মোহিত হলেন। বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল মেয়েটির কাছে। আসলে মেয়েটি তো ওই রাজারই সন্তান। মহারাজ তা জানতেন না। মেয়েটি খুব কাঁদল। পরের দিন ভোরে গ্রামের পাশের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল সে। রাজা পরে সব জানলেন। কী বুঝলেন জানা গেল না। যে নদীতে রাজকুমারী আত্মঘাতী হলেন সেই নদীর নাম আলাইকুমারী নদী। এখনও নদীটি কান্নার শব্দে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। এমনই লোক পূরাণ এই রাজ্যে!

পাঁচ

'কে যায়? কোথায় যাবেন?' 'যামো গড়কাঁটা মাসান-গোসানী বাড়ি ১ নং পঞ্চায়েত।' 'কী কাজ সেখানে?' 'মাসান থানে পুজমো, মানা-ছিনা করমো।' পথিক পথ চলে। একটা গাছের ছায়ায় একটা প্রাইমারি স্কুল।

কচি-কাঁচারা পড়ছে—

একের পিঠে এক	আকাশ পাতাল ঠেক।
একের পিঠে দুই	তুই আর মুই।
একের পিঠে তিন	অচিনকে চিন।
একের পিঠে চার	তুমি এখন কার।
একের পিঠে পাঁচ	ভূয়ে লাগাও গাছ।
একের পিঠে ছয়	জয় গোসানীর জয়।
একের পিঠে সাত	তেলা মাথায় হাত।
একের পিঠে আট	রাসমেলার মাঠ।
একের পিঠে নয়	একতার জয়।
একের পিঠে দশ	প্যাঁচা পেঁচির বশ।

এমন সময়ে মাস্টারমশাই গাছের ছায়াতে একজন গ্রাম্য চাষির সঙ্গে হিসেব কষতে ব্যস্ত। চাষিটি বালির উপর একটি কাঠি দিয়ে তার নেওয়া ধারের হিসেব কষছিল— 'হ্যাঁ, একুনে হৈল দুই শত পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এলা মুই দিবার না পাইম।'

এই না বলে সে তার বালির স্লেটের সব হিসেব মুছে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাস্টারমশাই বললেন, 'তুই বড় সেয়ানা আছিস। ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে। আরবার ধার বুলি আইলে বুঝবু মজা।' নির্বিকার লোকটি হাঁটা দিল। মাঠভর্তি তামাক আর তামাক— কুলাপাতি, শকুনিমামা, বড়মেনি, ছোটমেনি, পাটুয়াখুলি, সিন্দুর খটুয়া, নাও খোলা আরও কত জাতের তামাক। একটি ছোট ছেলে বাপ-দাদাকে দিবে বলে হুকোটা ধরিয়ে ফুরুক-ফুরুক, গুরুক-গুরুক করতে করতে যাচ্ছে যাতে হুকো নিভে না যায়।— পথিক এমন দৃশ্য কমই দেখেছে।

ছয়

বাউল গান গায়, 'মনরে, তোমার মাঝে বসত করে কয়জনা তা জানো না...।' আসলে কোনও অঞ্চল শুধু দালান কোঠা নয়, নথিপত্র ও বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থান মাত্র নয়। মনোময় মানুষের মনে অনেক কিছু বাস করে। তাই তাকে জানা চাই নইলে হিসেব হবে গরমিল। সম্প্রীতির কত সহজ পন্থা এখানে কাজ করে যাচ্ছে আলো-হাওয়ার মতো তার হিসেব কি আমরা রাখি।

দীঘির বা নদীর একগলা জলে দাঁড়িয়ে দুইজন রমণী পরস্পককে জড়িয়ে ধরে বলে, 'সই, সইল সই, মনের কথা কই।' আর এইভাবেই তারা হয়ে যায় পরস্পরের বান্ধবী। বিয়ের আসরে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে জলের ছিটে দিয়ে হয়ে যাওয়া যায় পরম বন্ধব—'বাবা'। দিন পালটাচ্ছে। এখন মঙ্গল কামনায় প্রসারিত হাত সংকুচিত। পাঠশালায় শোনা যাবে না বর্ণমালা শেখার ছড়া—

'ক'— কালো প্যাঁচা যাচ্ছে উড়ে।
'খ'— খগেন্দ্রনারায়ণ রাজা ধরে।
'গ'— গড়কাঁটা মাসান যাব।
'ঘ'— ঘোড়া ঘাটে ঘোড়া পাব।

কথায় বলে নদী শুকিয়ে গেলেও তার রেখা থাকে। লোকায়ত ধ্যান-ধারণা, কথা-কাহিনি, লোক পুরাণও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতোই বয়ে চলে। সে সব না জানলে সবই ফাঁপা, সবই শূন্য।

দিগ্বিজয় দে সরকার

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-9, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

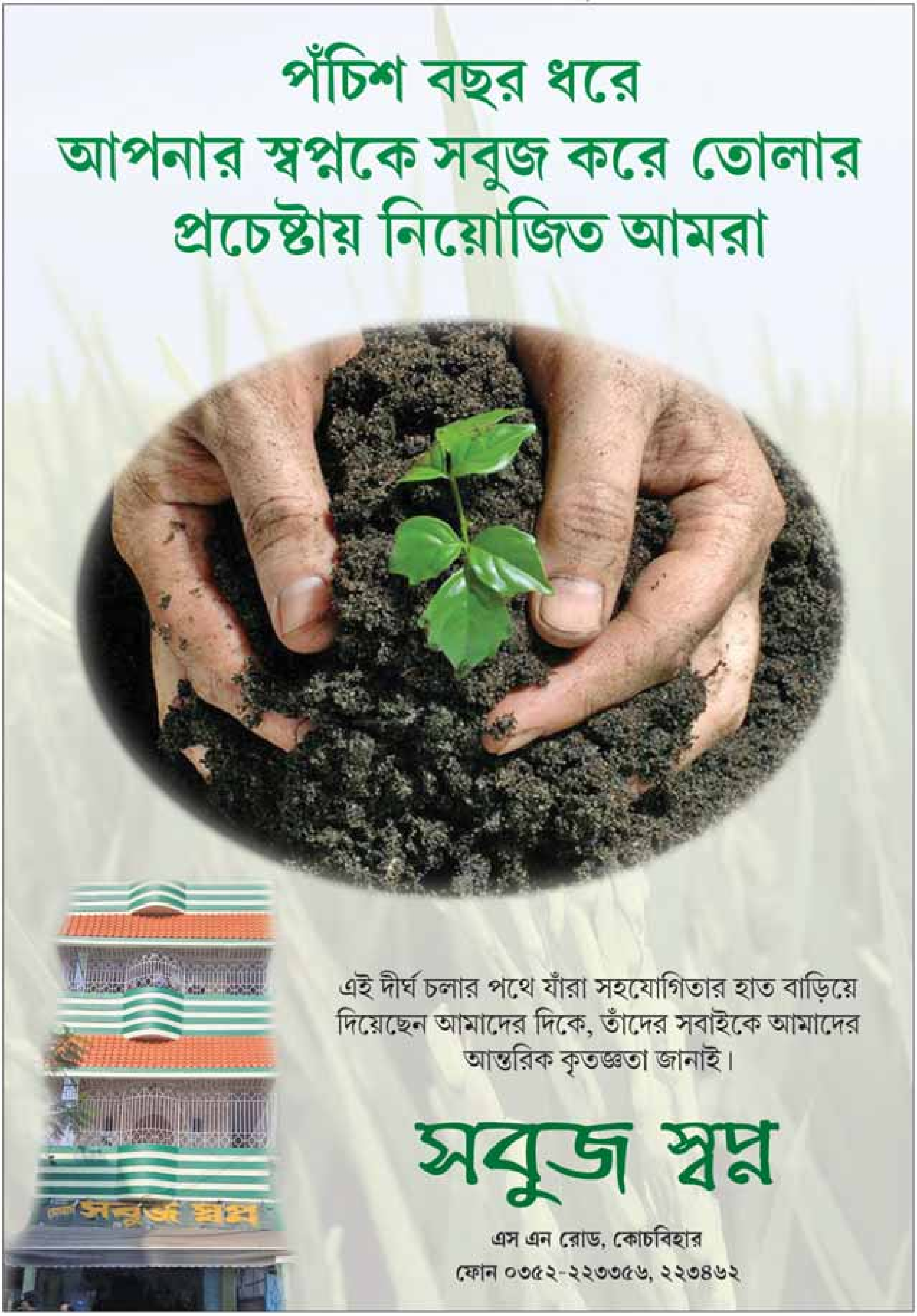

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.